ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ।। ২১ অগ্রহায়ণ, ১৪১৬ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১১) ৭ ডিসেম্বর, ২০০৯ ।। Website : www.eswastika.com

নেপাল থেকে নাগাল্যাণ্ড

মাওবাদী-সিপিএম একাকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ লালগড়সহ এরাজ্যের মাওবাদীদের পিছনে নেপাল ও চীনের সরাসরি মদত রয়েছে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম্ মন্তব্য করেছেন। রাজ্য পুলিশের ডিজি ভূপিন্দর সিংও সম্প্রতি এক সাংবাদিক বৈঠকে মহাকরণে বসে বলেন, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী এরাজ্যের মাওবাদীরা চীন ও নেপালের সহযোগিতা পাচ্ছে। তাঁর একথা বলার পর সি পি এম কিন্তু নেপাল ও চীন প্রসঙ্গে একেবারে চুপ মেরে গিয়েছে। সশস্ত্র বিপ্লবের পর যখন নেপালের মাওবাদী নেতা প্রচণ্ড আত্মপ্রকাশ করলেন, তখন সবার আগে ভারত থেকে ছুটে গিয়েছিলেন সীতারাম ইয়েচুরি। যেভাবে বৈঠক হয়েছিল, তাতে প্রমাণ হয়, নেপালের মাওবাদীরা যখন অস্ত্রহাতে 'সমাজ' পরিবর্তনের পক্ষে ছিলেন তখন সি পি এমের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ ছিল। এখন সিপিএম এনিয়ে বিশেষ মুখ খুলছে না। সম্প্রতি রাজ্য পুলিশ প্রসূন চট্টোপাধ্যায় এবং রাজা সরখেল নামে দুই ব্যক্তিকে মাওবাদী সন্দেহে গ্রেপ্তার করেছে। গোয়েন্দাদের জেরার মুখে প্রসূন কবুল করেছে, যে সে নিয়মিত নাগাল্যাণ্ডে যেত। কারণ, মাওবাদীদের জন্য তারা ন্যাশনাল সোসালিস্ট কাউন্সিল অব নাগালিম বা এন এস সি এনের সঙ্গে চুক্তি করে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করত। এন এম সি-এন আবার চীনের বার্মা লাগোয়া ইউনান প্রদেশ থেকে এই অস্ত্র নিয়ে আসত। ঘুরপথে চীনের অস্ত্রই লালগড়ের মাটিতে ব্যবহার হচ্ছে। তা সত্ত্বেও এরাজ্যে সিপিএম

ইয়েচুরি

প্রচণ্ড

(এরপর ৪ পাতায়)

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুরহস্য উন্মোচনে সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ লীগাল ফোরাম

।। গূঢ়পুরুষ ।। অল ইন্ডিয়া লিগাল এইড ফোরাম ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কাশ্মীরে জেল হেফাজতে থাকাকালে রহস্যজনক মৃত্যুর প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটনে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছে। গত ২৬ নভেম্বর কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে ফোরাম প্রতিনিধিরা দাবী জানিয়েছেন যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ভারত কেশরী ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর সমস্ত তথ্য 'বিশেষ গোপনীয়' বা ক্লাসিফায়েড ইনফরমেশন বলে ফোরামকে জানাতে অস্বীকার করেছে। তাই ফোরামের আইনজীবীরা ভারতীয় সংবিধানের ৩২নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সুপ্রিম কোর্টে শীঘ্রই আবেদন জানাবেন। সংবিধানের ৩২নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে ভারতীয় নাগরিকের সাংবিধানিক মৌলিক অধিকারগুলি খর্ব বা খারিজ করার চেষ্টা করা হলে এই অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানানো যাবে।

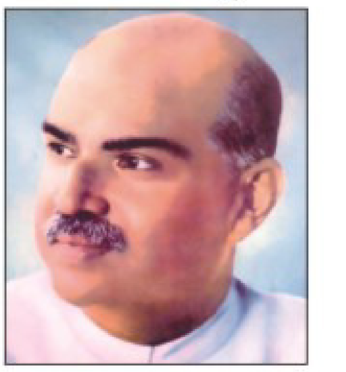

ফোরামের পক্ষ থেকে মোট ছয়টি মৌলিক প্রশ্ন তোলা হয়েছে। যেমন, ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হার্ট অ্যাটাকে হয়েছিল বলে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়। প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, কোন তথ্যের ভিত্তিতে তদানীন্তন নেহরু সরকার এমন ঘোষণা করেছিল? মৃতদেহের ময়না তদন্ত কি করা হয়েছিল? যদি করা হয়ে থাকে তবে সেই ময়না তদন্তের রিপোর্ট আজও কঠোরভাবে গোপন রাখা হয়েছে কেন? জেল হেফাজতে থাকাকালে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করা হয়েছিল কি? নেহরু সরকার দাবী করেছিল যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করা হয়েছিল। ভাল কথা। তবে চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দেখতে দেওয়া হবে না কেন? ডঃ মুখোপাধ্যায় তখন একজন অতি সম্মানীয় সাংসদ এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। অথচ তাঁর জেল হেফাজতে মৃত্যুর পর কোনও উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হয়নি কেন? দেশের আইনে বলা আছে যে পুলিশ

(এরপর ৪ পাতায়)

বাবরি ধাঁচা

সেকুলারবাদীদের কি পৈতৃক স্মৃতিচিহ্ন?

শিবাজী গুপ্ত।। পর্বত মূষিক প্রসব করেছে। ১৭বছর প্রসব বেদনায় ভুগে এবং ৪০ বার প্রসবের তারিখ পরিবর্তন করে অবশেষে গত ৩০শে জুন, বোধ হয় আর 'লেবার-পেইন' সহ্য করতে না পেরে এক রিপোর্ট প্রসব করেছে অর্থাৎ পেশ করেছে—এক মনমোহন আরেক মনমোহনের হাতে। কিন্তু তারপরও পাঁচ মাস রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি লাভক্ষতির অঙ্ক স্থির করতে না পেরে।

এদিকে ৬ মাসের মধ্যে রিপোর্ট লোকসভায় পেশ করতেই হবে। শেষের দিন ঘনিয়ে আসছে। অথচ উপযুক্ত শুভক্ষণ অর্থাৎ, বিজেপি ও আর এস এস নেতাদের ঘায়েল করার লগ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। চারদিকে জন-অসন্তোষের আগুন ধূমায়িত হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য -বৃদ্ধিতে মানুষ ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। আখ চাষীরা আখের ন্যায্য মূল্যের দাবীতে এবং সরকার নির্ধারিত দাম রুখতে আখের দণ্ডহাতে লোকসভা ঘেরাও করেছে। চাষীদের আত্মহত্যা চলছে অপ্রতিহত ভাবে, সারা দেশ পাকিস্তানী জেহাদী ও সন্ত্রাসীদের প্রমোদ উদ্যানে পরিণত হয়েছে, একের পর এক মন্ত্রী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে শত সহস্র কোটি টাকা-ঘুষ ও অবৈধ-অর্থ উপার্জনের অভিযোগ উঠছে।

এসব অপশাসন ও কেলেঙ্কারী চাপা দিতে রামমন্দির ভাঙার মতো অস্ত্রই শাসক শ্রেণীর হাতে একমাত্র হাতিয়ার। সুতরাং মনমোহন দেশ ছেড়ে আমেরিকা পাড়ি দিয়েছে। আর কংগ্রেস সভানেত্রী ১০নং জনপথে এমন গা ঢাকা দিয়ে থাকেন যে, তার টিকিটি (এখানে খোঁপাটি) দেখার জো নেই। সামনে আবার কয়েকটি রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন। সুতরাং মুসলমানদের দিল্ খুশ করে তাদের দলবদ্ধ ভোট আদায় করতে বাবরি মসজিদের জন্য কান্নাকাটি করতে হবে। ফলে চুপিসারে রিপোর্ট লোকসভায় পেশ না করেই তা সংবাদপত্রে লিক্ করে দেওয়া হল।

চারদিকে হৈ হৈ রব উঠল। একটা মিথ্যা ঢাকতে দশটা মিথ্যা কথা বলা হল। মনমোহন লিবারহান বলছেন তার কাছ থেকে রিপোর্ট ফাঁস হয়নি; স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী চিদাম্বরম্ বলছেন, তার আলমারি থেকেও রিপোর্ট ফাঁস হয়নি। তাহলে রিপোর্টের কয়টি পাতা কি চড়ুই পাখি কুড়িয়ে নিয়ে সংবাদপত্র অফিসে জমা দিল? আসলে রিপোর্ট ফাঁস করে বাজার বোঝার কংগ্রেসী অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।

রামজন্মভূমিতে অস্থায়ী মন্দির, চিরস্থায়ী রামলালা।

দেশের লোকের একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, ক্ষমতা দখল ও ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য এমন কোনও অপকর্ম নেই যা কংগ্রেস দলটি করতে না পারে! এই দলটির জন্ম সাম্রাজ্যবাদীদের ঔরসে। সুতরাং এই দলের সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র—Divide & Rule—ভাগ করে শাসন কর—যাবে কোথায়। ক্ষমতা দখল ত্বরান্বিত করতে যারা মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদ করতে পারে তাদের কাছে নৈতিকতা, শালীনতা ও সৌজন্যবোধ আশা করাই বৃথা। কোনও অপকর্ম করেই এরা লজ্জিত হয় না।

আর মুসলিম তোষণ তাদের অস্থিমজ্জায় মিশে রয়েছে। জিন্না ও মুসলিম লীগ দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে নিরপরাধ হিন্দুদের কোতল করে ভারত ভাগের পথ পরিষ্কার করেছে বলেই না নেহরু এণ্ড কোং গদিতে আসীন হয়েছেন এবং তিনপুরুষ ধরে দেশবাসীর উপর ডাণ্ডা ঘোরাতে পারছেন।

সুতরাং জিন্না ও মুসলমানদের কাছে এদের কৃতজ্ঞতা অপরিসীম। তাতে হিন্দুস্বার্থ, হিন্দুধর্ম, হিন্দু সংস্কৃতি জাহান্নমে যাক—তাতে এই পরিবারের কিছু যায় আসে না। কারণ, যে বংশে মুসলমান ও খৃষ্টান রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে তারা কোনও মতেই ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ধর্মের অনুরাগী হতে পারে না। ক্ষমতা দখল ও ভোগ করতে মুসলমানী শাসকদের মানসিকতাই নেহরু গোষ্ঠীর আচরণে দেখা যায়।

বাবরি ধাঁচা বা রামমন্দির ভাঙা গেছে তাতে কংগ্রেসেও ছিকুলারদের মধ্যে এমন মড়াকান্না কেন? এদের বাপের তালুক কি লাটে গেছে। এটা কি তাদের বাপের চিতার মঠ? সারা পৃথিবীতে শত শত মসজিদ ভাঙা পড়ছে, ইরান-ইরাক যুদ্ধ, ইরাক-আমেরিকা যুদ্ধে, আফগানিস্তানে আমেরিকার বোমা-কামান-রকেটের আঘাতে। পাকিস্তানে আল কায়েদা—তালিবানদের বোমা বিস্ফোরণে রকেট নিক্ষেপণে শত শত মসজিদ গুঁড়িয়ে যাচ্ছে—তাতে মুসলমানদের ফিনফিনে সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি লাগে না—যত শোক

(এরপর ১৫ পাতায়)

তৃণমূলের বিজয় মিছিলে আল্লা-হো-আকবর ধ্বনি

সংবাদদাতা ঃ গত ১৫ নভেম্বর বিকেলে তারিখ বৈকাল ৪টায় উপনির্বাচনে জয়লাভের পর জাঙ্গিপাড়ার সুফীজঙ্গল ও বাহানা গ্রাম থেকে তৃণমূলের একটি বিজয় মিছিল বের হয়। উল্লেখ্য, ওই মিছিলে বেশিরভাগই মুসলমান এবং অল্পসংখ্যক হিন্দু ছিল। মিছিল 'আল্লাহো আকবর' ও 'নারায়ে তক্‌দির'-প্রভৃতি ধ্বনি দিতে দিতে বোড়হল, নিকাশ, খুঁড়িগাছি ও দিলাকাশ গ্রাম পর্যন্ত যায়। বোড়হল, নিকাশ, খুঁড়িগাছি ও দিলাকাশ গ্রামগুলি হিন্দু অধ্যুষিত। মিছিলটি বাহানা, সুফীজঙ্গল থেকে বেরিয়ে যখন বোড়হল, নিকাশ পেরিয়ে খুঁড়িগাছিতে পৌঁছায় সেখানে হিন্দুদের ওপর তারা চড়াও হয়। ফলে এলাকার বহু হিন্দু আহত হয়। তারপর দিলাকাশ হয়ে ফেরার পথে বোড়হল গ্রামের হিন্দুদের ওপর আবার অত্যাচার করে এবং দোকানপাট ভাঙচুর করে। বোড়হল গ্রামের সুপরিচিত দীর্ঘদিনের বি.জে.পি কর্মী প্রসেনজিৎ বাগকে ব্যাপক মারধর করে। ফলে তাকে স্থানীয় হস্‌পিটালে ভর্তি করতে হয়। তাঁর বাঁ-পায়ের অবস্থা সংকটজনক। তাঁকে সুফীজঙ্গলের জব্বর মল্লিক (পিতা ইসমাইল মল্লিক) ও সেখ রজব আলি (পিতা-সেখ সাজ্জাদ আলি) লাঠি দিয়ে আঘাত করে এবং পালিয়ে যায়। এলাকার তৃণমূলী দুষ্কৃতী যার নামে অনেক মামলা ঝুলছে সেই সেখ মইনুদ্দিন (ডাক নাম বুলো) দীর্ঘদিন থেকেই এলাকায় মুসলমানদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছে। তারই জের হিসাবে গত ১৫ নভেম্বর বিকেলে তারিখ বৈকালে তৃণমূলের ব্যানারে আরও একবার মহড়া চালালো। জাঙ্গিপাড়া থানা যদিও কিছু মুসলমান দুষ্কৃতীকে তুলে নিয়ে যায় তবুও তাদের শাস্তির বিষয় কী হবে তা বলা মুসকিল। এলাকার হিন্দুরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ। গত ১৯ নভেম্বর তারিখ সকাল থেকে এই ঘটনার প্রতিবাদে জাঙ্গিপাড়ার বি.জে.পি-র ডাকে ১২ ঘণ্টার বন্ধ পালিত হয় ওই এলাকায়। বন্ধ হয়েছিল সর্বাত্মক।

আয়ের সুবর্ণ সুযোগ!!!
SBI Life Insurance প্রমোট করছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় ব্যাঙ্ক State Bank of India, SBI Life সীমিত সংখ্যক Insurance Advisor নিয়োগ করছে।
যে কোনও পুরুষ / মহিলা HS পাশ / পিয়ারলেস, GTFS, Alchemist, Rose Valley ও সাহারা Agent / VRS নেওয়া Govt. Employee / Postal Agent / অবসরপ্রাপ্ত Bank Employee-রা আবেদন করতে পারেন।
যারা সফল কেরিয়ার করতে ইচ্ছুক তারা Interview-র জন্য যোগাযোগ করুন –
Mr. Ajoy Kumar Saha Mobile : 9830952221
SBI Life
INSURANCE
With Us, Your's Sure

লিবারহান রিপোর্ট সত্যের অপলাপ

দিল্লী থেকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সভাপতি অশোক সিংঘলের বিবৃতি

নিউ দিল্লী, ২৭ নভেম্বর, ২০০৯।। অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমির উপর একটি সুরম্য রামমন্দির নির্মাণ করতে ভারতের সাধুসমাজ, সমগ্র হিন্দুসমাজ এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ বদ্ধ পরিকর। এ কাজে যে কোনও রকমের ত্যাগ স্বীকার করতেও সকলে প্রস্তুত। শ্রীরামজন্মভূমি আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাভিমান, আমাদের আত্মসম্মান এবং ধর্মীয় আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতীক। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেরণাস্থল এবং জাতীয় সংহতির মানবিন্দু এই স্থান। নেহরুর আমলে সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণকে চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয় নেহরু মন্ত্রী পরিষদ। ওই একই পন্থা অনুসরণ করে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির উচিত সংসদে এই মর্মে এক নূতন আইন প্রণয়ন করা এবং ভগবান শ্রীরামের জন্মস্থান শ্রীরামজন্মভূমি হিন্দুদের হাতে তুলে দেওয়া।

জেহাদী আক্রমণকারীরা ভারতে প্রায় ত্রিশ হাজার মন্দির ধ্বংস করেছে। হিন্দুসমাজ কেবল মাত্র তিনটি মন্দির ফিরে পেতে চায়—অযোধ্যা, মথুরা এবং কাশীর মন্দির। আমাদের রাষ্ট্রীয় দাসত্ব ও অসম্মানের, লজ্জার সাক্ষ্যরূপী প্রতীকগুলি দূর করে, হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করার জন্য সংগ্রামের মাধ্যমেই আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা অর্জন করতে পারব। প্রকৃত হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করতে হলে ওই সকল স্থানগুলি থেকে মুসলিমদের দাবী নাকচ করে সংসদে গৃহীত আইনের মাধ্যমে সেসব হিন্দুদের হাতে তুলে দিতে হবে।

মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরাম আমাদের নিকট আবির্ভূত হয়েছেন দুষ্টের দমনের জন্য। বিশ্বব্যাপী দুরাত্মাদের বাড়-বাড়ন্ত, হিংসা ও অত্যাচারে পৃথিবী যখন কম্পিত তখন বীর শিরোমণির আবির্ভাব। গান্ধীজীর স্বপ্নের বিষয় ছিল 'রামরাজ্য'; যেখানে থাকবে সত্যের প্রতিষ্ঠা, প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবেশে গ্রামের সাথে নাগরিক সুযোগ-সুবিধারও অস্তিত্ব থাকবে।

শ্রীরামজন্মভূমি পরিসরে 'গ্রাউণ্ড পেনিট্রেটিং রেডার সার্ভে' (জি পি আর এস) -র মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ প্রাচীন মন্দির-ইমারতের পরিকাঠামোর যেমন প্রমাণ পাওয়া গেছে, তেমনই পুরাতাত্ত্বিক খননাদির মাধ্যমে জানা যায় যে, ১৫২৮ খৃষ্টাব্দের পূর্বেও এক বিশাল মন্দিরের অস্তিত্ব ঐ একই স্থানে বিরাজ করছে। জেহাদী আক্রমণকারী বাবরের দ্বারা যে মন্দির বিধ্বস্ত হয়েছে, সেখানে বাবরের নামে গড়ে উঠেছিল দাসত্বের সাক্ষ্য, প্রাচীন সংস্কৃতির উপর আঘাতের চিহ্ন। বাবর কোনও ফাঁকা জায়গা-জমি দখল করতে অযোধ্যায় যায়নি, গিয়েছিল তার জেহাদী পরিকল্পনা মাফিক। রাষ্ট্র এবং সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র রূপে বিরাজমান জন্মভূমিই ছিল আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। বাবরি কাঠামো তাই কেবল মাত্র একটি আক্রমণকারীর রাজনৈতিক চালের চিহ্নস্বরূপ। হিন্দুসমাজ কখনই এ রকমের অত্যাচার বা তার প্রতীককে মেনে নেয়নি। হিন্দুদের লাঞ্ছনা ও অপমানের প্রতীক নিশ্চিহ্ন করে সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার জন্য তারা বার বার যুদ্ধে নেমেছে। শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তির জন্য ৭৬ বার যুদ্ধে নেমে আমাদের লক্ষাধিক সহযোগী শহীদ হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় অসম্মানের সাক্ষ্যবহনকারী পরিকাঠামোটি ধসে পড়ল ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ সালে। ভগবান শ্রীরামলালা (শিশু রামচন্দ্র) বর্তমানে সেখানে বিরাজমান। অলৌকিক ভাবে সেখানে তাঁর আবির্ভাবে সারা হিন্দুসমাজ হয়ে উঠেছিল আনন্দবিহ্বল। আদালতে বিচারপতির আদেশে বিরাজমান রামলালার পূজা-প্রার্থনা চলছে উক্ত জন্মভূমি পরিসরে। তখন থেকেই সেখানে কখনও কেউ নামাজ পড়েনি। মসজিদের কোনও লক্ষণও সেখানে নেই। শ্রীরামজন্মভূমি চিরকালই হিন্দুদের ধর্মস্থান, পীঠস্থান—যা ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। ৬ ডিসেম্বর একটা কাঠামো সরে গেছে। কোনও রকম দাঁড়িয়ে থাকা ধাঁচা সরে গিয়ে রাস্তা করে দিয়েছে বিশাল শ্রীরামমন্দির গড়ে তোলার জন্য।

বিচারপতি লিবারহান

হিন্দুরা মামলা শুরু করেছিল ১৯৫০ সালে। মুসলিম ওয়াকফ বোর্ড মামলা শুরু করে ১৯৬২ সালে। জেলা আদালতে মামলা চলে প্রায় ৪০ বছর। হাইকোর্টে চলতে থাকে প্রায় ২০ বছর। তবুও এখনও কোনও পথের শেষ দেখা যাচ্ছেনা। সারা জীবন ধরে মামলা চলার এক প্রকৃষ্ট উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গড়ে উঠছে সেই প্রবাদ বাক্যের—বিলম্ব বিচার, বিচারের নামে প্রহসন। এখনও কেস টেনে টেনে চলছে, আর চলছে কিছু স্বার্থান্বেষীদের জন্য। সরকারও কোনও না কোন ছলে 'বিচারাধীন বিষয়' বলে বার বার ঘোষণা করায় দেশব্যাপী জনগণের বিরক্তি, ক্রোধ এবং হতাশা বাড়িয়েই চলে।

হাইকোর্টের রায়দানের প্রস্তাবিত সময় ছিল ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯২ তারিখের পূর্বে। বিষয় ছিল ১৯৯১ সালে উত্তরপ্রদেশ সরকারের ২.৭৭ একর জমি অধিগ্রহণ। জমিটি শ্রীরামজন্মভূমির লাগোয়া জমি। তিন বিচারপতির মধ্যে অন্যতম বিচারপতি রাজা তাঁর রায়ের অংশ স্থগিত করে দেন। ওই সময় লক্ষ লক্ষ করসেবক অযোধ্যায় সমবেত হয়েছিলেন। হাইকোর্টের এইরূপ অবস্থান প্রচণ্ড ভাবে ক্ষুব্ধ করে তোলে করসেবকদের। তাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ৬ ডিসেম্বর ঘটনা। আসল প্রশ্ন হল—কার বা কাদের চক্রান্তে রায় স্থগিত হল? কেন্দ্র সরকারের ইশারা ছাড়া এটা কি আদৌ সম্ভব? কেন্দ্র সরকার যদি এটাকে অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয় মনে করে থাকেন, তাহলে তাদের মধ্যে এরকম খামতি এল কি করে? উপরোক্ত মামলার শুনানী শেষ হয় ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৯২। যদি কেন্দ্র সরকার এবং বিচারপতি রাজা ইচ্ছা করতেন, তাহলে ৬ ডিসেম্বরের পূর্বেই সেই রায়দান সম্ভব হতে পারত। উপযুক্ত সময়ে রায় দান হলে তার অন্যরকম পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারত।

৬ ডিসেম্বরের ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত বলে যে কথাবার্তা ভাসছে, তা প্রকৃতপক্ষে সত্যের বহু দূরে। আর লিবারহান অযোধ্যা কমিশনে ব্রহ্মলীন পরমপূজ্য দেওরাহা বাবার নাম সন্দেহভাজনদের তালিকায় উঠেছে, এটি সারা দেশের সন্তসমাজের চরম অপমান। কমিশনের এই কালিমালেপন কোটি কোটি ভক্ত শিষ্যদের নিকট বেদনাদায়ক। সন্তসমাজ ব্যথিত। কমিশনের এভাবে নামোল্লেখ করাটা সমাজ ও সাধুদের কাছে উস্কানিমূলক বিষয়। কমিশন হয়তো উসকানি দিয়ে সাধুসন্তদের বিক্ষুব্ধ করে তুলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াতে চায়। কমিশনের দেউলিয়াপনা দেখা যায় যখন অটলজীর নামও সহ-চক্রান্তকারী বলে উল্লেখ করা হয়। আমরা পূজ্য সন্তমণ্ডলীর নিকট নিবেদন করি যে, তাঁরা এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে পুনরায় এগিয়ে আসুন। দেশের তরুণদের নিকট আবেদন, তাঁরা যেন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হন, আত্মদানের জন্য তৈরি থাকেন। আমরা রাজনৈতিক দলগুলিকে বলি, তারা যেন লিবারহান কমিশনের অযোধ্যা রিপোর্টকে অর্থহীন বলে ঘোষণা করেন এবং সংসদে আইন প্রণয়ন করে শ্রীরামজন্মভূমিতে বিশাল মন্দির নির্মাণে সাহায্য করেন। নতুবা হিন্দু সমাজ বাধ্য হবে রাষ্ট্রব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলতে। আর তা হবে সাধুসন্তদের উপস্থিতিতে আগামী হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ মেলায়।

এই সময়

মাত্র ৮ কোটি

বিচারপতি লিবারহান কমিশনের রিপোর্টে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীকে অযোধ্যায় রামজন্মভূমিতে বাবরি ধাঁচা ধ্বংসের জন্য দায়ী করা হয়েছে। অথচ কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তাঁকে একবারও ডাকা হয়নি। এমনকী কমিশনের রিপোর্ট ফাঁস হওয়ার পরও বিচারপতি মনমোহন সিং লিবারহান তাঁর এই অর্ধসত্য বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন। যদি কেউ এইরকম একটি অর্ধসত্য বা মিথ্যাকে খাড়া করার জন্য ১৭ বছর সময় নেয়, তাকে করুণা করা ছাড়া আর কীই বা করা যায়। ঘটনা হলো, লিবারহান শুধু নিজের মাইনে হিসেবে নিয়েছেন ৮ কোটি টাকা। করদাতাদের টাকায় কমিশনের পিছনে আর কত টাকা যে এমন ব্যয় হয়েছে তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি।

আপসের পথে

নেপালে মাওবাদীরা ক্রমশ অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ছে। নেপালে কমিউনিস্ট পার্টি, নেপালি কংগ্রেস ও মধেসি জনাধিকার মঞ্চের জোট সরকার এখন মসৃণভাবেই সরকারি কাজকর্ম চালাচ্ছে। মাওবাদী নেতা কমরেড পুষ্পকমল দহল ওরফে প্রচণ্ড ও তাঁর অনুগামীরা এখন বুঝতে পারছেন সরকার ছেড়ে রাস্তায় নেমে তারা ঐতিহাসিক ভুল করেছেন। ঔদ্ধত্য ঝেড়ে ফেলে এখন তাদের আপসের পথে আসতে হচ্ছে। কথায় আছে কঞ্চি ভাঙলেও মচকাতে চায় না। সেজন্য নেপালে মাওবাদীরা সমান্তরাল সরকার চালাবার কথা ঘোষণা করেছে।

উদ্বেগে কেরল

আরব দেশগুলির অন্যতম সমৃদ্ধ দেশ দুবাই। সেই দুবাই সরকার তখন বড় রকমের ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ায় সেখানে নির্মাণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের বেপরোয়া ছাঁটাইয়ের আশঙ্কা রয়েছে। এতে আতঙ্ক বোধ করছে কেরল। কেননা কেরলের ২০ লক্ষেরও বেশি মানুষ উপসাগরীয় দেশগুলিতে কর্মরত রয়েছেন। আর গোটা ভারতকে ধরলে সংখ্যাটা দাঁড়ায় ৪৫ লক্ষ। কেরলের অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের চার ভাগের এক ভাগই আসে উপসাগরীয় দেশগুলিতে কর্মরত রাজ্যের মানুষদের থেকে।

কাজের বহর

ন্যাশনাল হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এন এইচ ডি পি)-র অধীনে ১৪৫টি হাইওয়ে প্রোজেক্ট-এর কাজ শেষ হতে এখনও দুই থেকে ছয় বছর দেরি হবে বলে কেন্দ্র সরকার স্বীকার করে নিয়েছে। রাজ্যসভায় এক লিখিত উত্তরে সড়ক, পরিবহন ও হাইওয়ে দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী আর পি এন সি একথা জানিয়েছেন। ৫,৩১১ কিলোমিটারের মধ্যে এখন পর্যন্ত ২৯৪৩ কিলোমিটার হাইওয়ে তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার স্বর্ণিম চতুর্ভুজের মাধ্যমে সারা দেশকে যুক্ত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। ইউ পি এ সরকার দ্বিতীয়বার সরকারে এলেও এখনও তা শেষ করতে পারেনি। কাজের বহরের নমুনা বটে!

হতভাগ্য প্রবাসী

আর্থিক মন্দায় আক্রান্ত ইংল্যাণ্ডে চূড়ান্ত সমস্যার মধ্যে পড়েছেন ভারতীয় ছাত্র-রা। আগে আংশিক সময়ের কোনও কাজকর্ম যোগাড় করে তাঁরা যেভাবে হোক নিজেদের খরচাটুকু অন্ততঃপক্ষে নিজেরা চালিয়ে নিতে পারতেন। কিন্তু ইদানীং মন্দার বাজারে সেই আংশিক সময়ের কাজ জোটানো যাচ্ছে না কোনওভাবেই। উপোসের হাত থেকে বাঁচতে শ'য়ে শ'য়ে ইংল্যাণ্ডে পড়তে আসা ভারতীয়দের ভরসা সেখানকার গুরুদ্বারগুলি। তবে গুরুদ্বারগুলিতে স্রেফ খাওয়ার বন্দোবস্ত হচ্ছে, থাকার সমস্যা মিটছে না। তাই পরভূমিকে যারা স্বভূমি করে তুলতে চেয়েছিল তাদের রাত কাটছে এখন খোলা আকাশের নিচে, ফুটপাথে।

বেয়াদপ ছাত্র

লোকসভার অধ্যক্ষ হওয়ার চাইতে শিবপুর বি. ই কলেজ (এখন অবশ্য বেসু নামক বিশ্ববিদ্যালয়)-এর অধ্যক্ষ হওয়া যে ঢের ভালো ছিল তা হাড়ে হাড়ে এখন টের পাচ্ছেন মীরাকুমার। বি. ই. কলেজে বড়জোর সামান্য ঘেরাও-টেরাও, একটু আধটু গণ্ডগোল সইতে হোত। কিন্তু গণতন্ত্রের পীঠস্থানে গণতন্ত্রের কাণ্ডারী-রা (অর্থাৎ সাংসদরা) যেরকম অনুপস্থিত থাকছেন, বেসু-র কোনও নিম্নমানের ছাত্রও পড়াশোনাকে অতটা ভয় করেন বলে মনে হয় না। গত ৩০শে নভেম্বর লোকসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রশ্ন রাখা ৩২ জন এম পি নিজেরাই অনুপস্থিত ছিলেন! বাধ্য হয়ে লোকসভা মুলতুবী করতে হলো অধ্যক্ষ মীরাকুমারকে। এমন বেয়াদপ ছাত্র নিয়ে সত্যিই চলা দায়!

অন্যায় যে সহে

এতদিন অন্যায় যে করেছিল (অর্থাৎ আজমল কাসভ) এবং অন্যায় যে সইছিল (অর্থাৎ অন্যায়ের মদতদাতা কাসভের আইনজীবী আববাস কাজমি)-এদের বিরুদ্ধে ঘৃণা তো দূরের কথা, ভারতবর্ষের মহামান্য সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের এদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসাই যেন উপচে পড়ছিল। তাই জেলের মধ্যে কাসভকে জামাই আদর ও বিচারালয়ে তার হয়ে সাওকিরি করার জন্য আইনজীবী নিয়োগে বিচারের বাণী সত্যিই নীরবে নিভৃতে কাঁদছিল। তবে কাসভের বিচারের জন্য গঠিত স্পেশাল বেঞ্চের বিচারক এম. এল তাহালিয়ানি গত ৩০শে নভেম্বর 'ন্যায়ালয়ের সঙ্গে অসহযোগিতা' ও 'ইচ্ছাকৃতভাবে বিচারের সময় নষ্ট করার' অভিযোগে সরিয়ে দিলেন কাসভের আইনজীবী আববাস কাজমি-কে। শেষ বিচারের আশায় তবে কি এবার দিন গুনতে পারবেন দেশবাসী?

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

লিবারহান রিপোর্ট কিসের ইঙ্গিত ?

কংগ্রেস দলে এক বিদেশিনী সভাপতি হওয়া এবং ২০০৪ সালে কংগ্রেস দেশের ক্ষমতা দখল করিবার পর হইতে দেখা যাইতেছে দেশের বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ ক্রমশঃই তাহাদের স্বাতন্ত্র্য হারাইতেছে। তিনটি বিভাগেরই রাজনীতিকরণ ক্রমশঃই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এটা বুঝিবার জন্য পণ্ডিত হইবার কোনও প্রয়োজন নাই যে আজকাল কোনও তদন্ত রিপোর্ট তাহা কোনও বিচারপতিরই হউক, কিংবা তাহা সি.বি.আই-এরই হউক, কোনও সম্প্রদায়কে সুড়সুড়ি দিতেই হউক অথবা কোনও রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির চরিত্র হনন করিতেই হউক, তাহা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কেবল আসন্ন নির্বাচনগুলির, সে কেন্দ্রেই হউক বা রাজ্যগুলিতেই হউক, পূর্বেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। যেমন গুজরাটের নির্বাচনের পূর্বে গুজরাট দাঙ্গা বা পুলিশের সঙ্গে গুলি বিনিময়ে কোনও মুসলিম জঙ্গির মৃত্যুর সম্পর্কিত কোনও না কোনও বিচার বিভাগীয় বা প্রশাসনিক রিপোর্ট প্রকাশিত হইবেই। উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনের পূর্বে ঠিক তেমনিভাবে অযোধ্যা কাণ্ড রিপোর্ট, সি. বি. আই.-এর চার্জসিট ইত্যাদি পেশ হইবেই। আর লোকসভা নির্বাচন হইলে তো কথাই নাই। যেন আর কোনও সমস্যাই সমাধান করিবার নাই। শুধুই মুসলমান ভাইবোনদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়াটাই ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল এবং এই দলটির নিকট আত্মবিক্রিত গণমাধ্যমগুলির একমাত্র কাজ যে 'হিন্দুরাই তোমাদের শত্রু, তোমাদের সমস্ত অভাব-অনটন-অপ্রাপ্তির মূল কারণ হিন্দুরাই'।

এবারের লিবারহানের রিপোর্ট ফাঁস বা পেশ—দুইটিই হইতেছে ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা নির্বাচন এবং ৬ই ডিসেম্বরকে সামনে রাখিয়াই। ৬ই ডিসেম্বর অযোধ্যার বিতর্কিত সৌধটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কে বা কাহারা এই ধ্বংসের জন্য দায়ী; পিছনে কাহাদের মদত ছিল—এই ভ্যানতাড়া করিতে করিতেই ১৭টি বছর কাটিয়া গেল। সমস্যা যেখানে ছিল সেখানটাই সযত্নে রাখিয়া দেওয়া হইল যাহাতে সময়-সুযোগ মতো তাহা অস্ত্র হিসাবে কাজে লাগানো যায়। আজ হইতে ২০ বছর পূর্বে জার্মানির মানুষ তাহাদের বুকের উপর গড়িয়া তোলা কমিউনিস্ট দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ধুলায় মিশাইয়া দিয়াছিল। তাহা লইয়া তো কোনও হা-হুতাশ কোনও জার্মানিতেই শোনা যায় নাই। দুই জার্মানির সরকার বা রাজনৈতিক দিকই তাহা জনগণের আকাঙ্ক্ষা বলিয়াই শ্রদ্ধা করিয়াছিল এবং দুই দেশ এক সূত্রে গাঁথিয়া গিয়াছিল।

দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষের মানুষের! এদেশের মানুষ নাকি ট্র্যাডিশনাল আর এদেশের মানুষের এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যকেই কাজে লাগাইয়া রাজনৈতিক দলগুলি বাজিমাত করিয়া চলিয়াছে বছরের পর বছর। নতুনের সন্ধানে নয়, পুরানো ললিপপ মুখে গুঁজিয়া দিয়া মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে জনগণের। নেহরু পরিবার ছাড়া কংগ্রেস দলের নেতৃত্ব এদেশের মানুষ ভাবিতেই পারে না। সে নাতিই হউক কিংবা নাতবৌই হউক কিংবা নাতবৌয়ের ছেলেও হউক—শুধু নেহরু-রক্তের সম্পর্কিত হইলেই হইবে। হউক না সে পরদেশী।

রাজনৈতিক পট পরিবর্তন লইয়া এদেশের মানুষের কোনদিনই কিছু আসিয়া যায় নাই। কে এদেশে দখল করিয়া রাজা হইয়া বসিল—তাহাতে কিছুই কখনও আসিয়া যায় নাই। শুধু নকুলদানা কিংবা জল-বাতাসা দেওয়ার কুলুঙ্গিটি আর নমাজ পড়িবার জায়গাটি থাকিলেই চলিবে।

কংগ্রেস সরকার—আমেরিকার সঙ্গে কি কি গোপন চুক্তি করিয়া দেশের সর্বনাশ করিল; ডব্লু-টি ও'-র চাপে বিদেশী বাণিজ্য চুক্তি করিয়া দেশীয় বাজার-অর্থনীতির কি সর্বনাশ করিল—তাহা লইয়া এদেশের মানুষের কোনও চিন্তা নাই।

সনিয়া বিদেশিনী হইলে কি হইবে, তিনি অত্যন্ত কূটবুদ্ধি সম্পন্না। ঠিক বুঝিয়াছেন কোথায় সুড়সুড়ি দিলে কাজ হইবে। তিনি ভাল করিয়াই বুঝিয়া গিয়াছেন যে এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ এক কাণ্ডজ্ঞানহীন আত্মবিস্মৃত প্রজাতি। লিবারহান কমিশনের রিপোর্ট পেশ এমনই এক গেমপ্ল্যান।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

যেমন ব্যক্তি-মানুষের রয়েছে অন্তরাত্মা, যা তার আসল সত্তা, যা তার ভবিষ্যৎকে অল্পবিস্তর প্রকাশ্যে নির্ধারণ করে চলে, তেমনি প্রত্যেক জাতিরও রয়েছে আবার এক অন্তরাত্মা যা হলো তার প্রকৃত সত্তা, অন্তরাল হতে তার ভবিষ্যতকে রূপায়িত করে চলে। তাই হলো দেশের আত্মা, জাতির অন্তরের আস্পৃহার মূল কেন্দ্র, দেশের যা কিছু সুন্দর, মহৎ, শ্রেষ্ঠ ও উদার সে-সবের উৎস। প্রকৃত দেশপ্রেমিক দেশের এই অন্তরসত্তা ভারতে গড়ে উঠেছে প্রায় এক দিব্যসত্তা রূপে। প্রকৃতই যারা দেশকে ভালবাসে তারা এই দেশকে বলে, "Mother India" (ভারতমাতা)। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধির জন্য তাঁরই কাছে তারা নিত্য প্রার্থনা জানায়। দেশের যে সত্যকার আদর্শ, জগতে তার যে ব্রত তারই প্রতীক ও প্রতিমা হলেন ভারতমাতা।

—শ্রীমা

মাওবাদী বন্দুক গরীবিকে ব্যাপকতর করতেই সাহায্য করছে

স্বপন দাশগুপ্ত

মধ্যভারতের ব্যাপক বনাঞ্চল জুড়ে বে-আইনি ঘোষিত মাওবাদীদের ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের জেহাদ এবং কার্যকলাপের সপক্ষে একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যমের মানবতার নামে যে প্রচার চলছে তার সঙ্গে সম্ভবত নিঃশর্ত যুদ্ধ বিরতির কোনও সংস্রব নেই। এই সব মানবদরদীরা তখনই সামনে আসে যখন প্রশাসন সন্ত্রাসদমনে সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করে এবং এটা খুব পরিচিত ঘটনা। অবশ্য এটা বলাও ঠিক নয় যে, এইসব টিভি চ্যানেলগুলির স্মার্ট সুবক্তা অ্যাঙ্কররা তাদের চ্যাট-শোগুলিতে সবসময় এই "রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের" বিরুদ্ধে সরব হয় এবং যে লুকিয়ে থাকা মানুষগুলিকে তাদের চ্যাট-শো-তে সামনে এনে এইসব অঞ্চলের গরীব-গুর্বোদের জন্য অশ্রুপাত করে থাকে এমনটাও ঠিক নয়। তবুও এটা অস্বীকার করা যায় না যে, এইসমস্ত বিপথগামী চরিত্রগুলি ভারতবর্ষের সম্পর্কে যে মনোভাব পোষণ করে থাকে যার সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতীয় সহমতের সঙ্গে তালমিল নেই।

দেশের গণতন্ত্রকে এরজন্যে সাধুবাদ জানাতে হয় এবং সমাজের সহনশীলতাও সমভাবে প্রশংসনীয়। কারণ এইসব বিরুদ্ধ মতগুলিকে ভারতীয় সমাজ সামান্য মূল্যে ঠাঁই দিয়েছে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সুশীল সমাজের সঙ্গে। তথাপি এদেশে বিরুদ্ধ মতগুলি যেভাবে গুরুত্ব পেয়ে থাকে তা অনেক সময়েই পশ্চিমী গণতন্ত্রে অমিল, অধরা। বিবিসি-র কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স কার্যক্রমে বৃটিশ কট্টর জাতিবাদী দলের নেতাকে টেলিভিশনের চ্যানেলে দেখলেই মানুষজন যেমন ক্ষোভে ফেটে পড়ে তেমনটা এদেশে রাষ্ট্রবিরোধী ইসলামী সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিদের টি. ভি-তে দেখলে হয় না, কিংবা মাওবাদীরা পুলিশের মাথা কেটে ফেললেও তাদের বিরুদ্ধে আমজনতা বিক্ষোভ দেখায় না। একইরকমভাবে রাজ থ্যাকারের মারাঠীবাদের মতো প্রাদেশিকভাবে আমরা আইনের মাধ্যমে এবং ব্যালটের মাধ্যমে পরাস্ত করতে বেশি শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে মনে করি।

যাইহোক, এই সব ব্যক্তিদের টক্ শো-র আমন্ত্রিত ব্যক্তি হিসেবে যদিও বা মেনে নেওয়া যায়, সমাজের অংশ হিসেবে তাদের যুক্তিগুলিকে মেনে নেওয়া যায় না।

মাওবাদী শুভানুধ্যায়ীদের চিন্তাধারার আধার হলো ভারতীয় সমাজ এবং মাও সন্ত্রাসের মধ্যে সমন্বয় খুঁজে বের করা। তাই নাগরিক অধিকার রক্ষার পৃষ্ঠপোষকরা নাগরিক অধিকার রক্ষার নামে সহজেই নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি ঘোষণার কথা বলে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে, স্বদেশ-বিরোধীদের রাষ্ট্রের মর্যাদায় উন্নীত করে।

যখন নির্বাচিত সদস্যেরা সমস্ত বকেয়া ইস্যুগুলিকে আলোচনার টেবিলে আনতে আহ্বান জানায়, তখন এরা মাওবাদীদের বন্দুক ছাড়তে বলে। এই সহধর্মীরা একতরফাভাবে হিংসার দায় চাপিয়ে দেয় সরকারের ওপর। বাস্তবে এরা মাওবাদীদের দেশের নির্বাচিত সরকারের পাশাপাশি সমান্তরাল সরকার চালাবার জন্য সমর্থন দেয়। এইভাবে এরাই আজ জম্মু-কাশ্মীরে বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমর্থন জোগায়। কে বলতে পারে আগামীকাল আজমগড়ে এমনই কোনও আন্দোলনকে এরা মদত দেবে না?

টিভি চ্যানেলের চ্যাট-শো-তে এদের আলোচনায় বসানোর অর্থ হলো একদিকে যেমন এদের মতবাদের ওপর সহানুভূতিশীলতায় প্রদর্শন, অন্য দিকে তেমন জাতীয় বিপন্নতাকে মদত দেওয়ার এক উপায় হিসেবে এই মতবাদকে গ্রহণযোগ্যতায় সীলমোহর লাগিয়ে দেওয়া।

দ্বিতীয়ত, এই মতবাদে বিশ্বাসী তামাম নেতৃত্ব প্রচার চালাচ্ছে যে দেশের গণতন্ত্র এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে গরীব বিশেষত আদিবাসীদের উপেক্ষা করা হয়েছে। ফলতঃ এরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জনমত গড়তে সাহায্য করছে এই ভাবে যে, রাষ্ট্রই মদত দিচ্ছে লোভাতুর বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে এবং বড় বড় জমি-হাঙ্গরদের।

মজার বিষয় হলো যে, এইসব বহুচর্চিত মতবাদের সমর্থক এদেশে প্রচুর সংখ্যায় রয়েছে। মাওবাদীদের এই উত্থান সম্পর্কে অনেকের মত হলো এই যে, এর মূলে পোঁতা রয়েছে দেশের গরীবিয়ানার ভিতরে এবং অনুন্নয়নের ব্যাপার তৈরি করছে আত্মঘাতী যুবকদের, যারা নিজেদের সমাজবিচ্ছিন্ন জীব বলে মনে করে। বাম চরমপন্থার জন্ম কিন্তু দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে তৈরি হয়নি, বরং বলা যায় এদের তত্ত্ব রচিত হয়েছে মানুষের দারিদ্র্যকে ব্যবহার করে। উন্নয়নের বিরোধিতা করাই হল এই বামপন্থীদের লক্ষ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নয়নকে বানচাল করা। ছত্তিশগড়ের বস্তার বা মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলে মাওবাদী আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হলো জল, হ্যাণ্ড পাম্প ধ্বংস করা, রাস্তা তৈরিতে বাধাদান এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ফেলা। মাওবাদ অধ্যুষিত এলাকাকে আরও গরীব অঞ্চলে রূপান্তরিত করা। এইভাবে মাওবাদীরা নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে অন্য অঞ্চল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দারিদ্র্যকে আরও প্রকটিত করে। বাকিটা তাদের করে দেয় বন্দুকের নল।

ভারতীয় রাষ্ট্রে এরপর ঘটেছে বহু ভুল-ত্রুটি। নেহরুর আমলে সোভিয়েত মডেল অনুসরণ করে দ্রুত শিল্পায়নের নামে সাধারণ মানুষদের সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করা হয়েছে। যাই হোক, রাজনৈতিক সচেতনতার সঙ্গে অর্থনীতির উন্নয়নের মিশেলে দেশের কিছু গরীব রাজ্যের উন্নতি হয়েছে আর্থিক ও সম্পদের বন্টনের মধ্যে। যেমন ওড়িশার কালাহাণ্ডি ১৯৮০-র মাঝামাঝি পর্যন্ত ছিল এক বঞ্চিত অঞ্চল। আজ এই অঞ্চল রাজ্যের বৃহত্তম চাল উৎপাদক জেলা হিসেবে গণ্য। এই অঞ্চলের এখন নাটকীয় পরিবর্তন হতে পারত যদি মাওবাদীরা সেখানে ঘাঁটি গেড়ে বসত? বরং যদি মাওবাদীদের প্রতিরোধে সেখানে উন্নয়ন থেমে যেত তবে মাওপন্থীদের প্রতি নরম সুশীল সমাজ তাকেই অত্যাচার বলে অভিহিত করত। মাওবাদীদের পূর্বশর্ত হলো উন্নয়নের চাকাকে উল্টোদিকে ঘোরানো।

পরিশেষে বলা যায়, মাওবাদীদের ক্ষেত্রে হিংসাই হলো প্রধান হাতিয়ার রাজনৈতিক পালাবদলে ঘটানোর। স্পষ্টত মাওবাদীদের প্রধান লক্ষ্য হলো মানুষের রক্ত। লাল সন্ত্রাসের কাছে বৃহত্তর সংগ্রামে একজন মানুষের জীবনের কোনও দাম-ই নেই। এরকম নির্মম পন্থাই চীনে মাওবাদীদের প্রধান অস্ত্র। রক্তপাত হলো মাওবাদী আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ের নেতা চারু মজুমদার থেকে বর্তমান প্রজন্মের মাওবাদী নেতা কোবাড গান্ধী মূল যোগসূত্র। কিছু অদ্ভুত মানুষ এই রক্তপাতকে রোম্যান্টিসিজম বলে আহ্লাদিত হতে পারে, কিন্তু শুভবোধসম্পন্ন মানুষের কাছে এসব হল হতাশা, অমানবিকতার মূর্ত প্রতীক।

(লেখক বিশিষ্ট স্তম্ভ লেখক)

"বাম চরমপন্থার জন্ম কিন্তু দারিদ্র্যের মধ্যে থেকে তৈরি হয়নি, বরং বলা যায় এদের তত্ত্ব রচিত হয়েছে মানুষের দারিদ্র্যকে ব্যবহার করে। উন্নয়নের বিরোধিতা করাই হল এই বামপন্থীদের লক্ষ্য এবং যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নয়নকে বানচাল করা।"

বাংলা বন্‌ধ-এর সাফল্য উদ্দীপিত করল বিজেপিকে

এন. সি. দে॥ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-অধ্যুষিত পশ্চিমবাংলার মানুষ যারা বি. জে. পি.-কে ভালবাসে তারা ৩০শে নভেম্বর '০৯-এর বিজেপি-র ডাকা বাংলা বন্‌ধে বি. জে. পি.-র একক প্রচেষ্টার সফলতায় দারুণ উল্লসিত। মমতার আঁচলে-বাঁধা ভীরু কাপুরুষ বিজেপি'র রাহুমুক্তি ঘটায় অনেক সাধারণ মানুষও খুশি। এই বিজেপি'কেই দেখতে চায় তারা। শক্তিমান, সক্রিয় এক পুরুষ সিংহকে দেখতে চায় তারা;নিষ্ক্রিয় সততার কোনও মূল্যই নেই সমাজ-সংসারে। স্বামীজী সব সময় বলতেন, "শক্তিমান হও, দুর্বলের ভালো কথাও কেউ শোনে না। কিন্তু সবলের অন্যায় কথাও শোনে। বাকিগুলো ভেড়ার দল"।

৩০শে নভেম্বর সারাদিনই বিজেপি-ই ছিল প্রতিটি টিভি চ্যানেলে সংবাদ শিরোনামে। বিজেপি-তো এর আগে অনেক কর্মসূচী সারা রাজ্যেই পালন করেছে; কলকাতা শহরের প্রাণকেন্দ্রেও অনেক কর্মসূচী পালন করেছে; সেগুলি কোনটাই খবর হয়নি গণমাধ্যমগুলিতে। কারণ, সেগুলি ছিল ভদ্রস্থ, শান্তিপূর্ণ অর্থাৎ নির্বিষ। এই গণমাধ্যমগুলিই এখন বলছে বিজেপি বন্‌ধ সফল করতে পেশীশক্তির প্রদর্শন করেছে। কংগ্রেসের সেবাদাস একটি চ্যানেল আবার বলেছে—"বিজেপি-র বন্‌ধ ব্যর্থ হয়েছে।" কিসের ভিত্তিতে এই বিশ্লেষণ তারা তা প্রকাশ করেনি। যদি পেশীশক্তি প্রয়োগ করাটাই ব্যর্থতার মাপকাঠি হয় তাহলে আজ পর্যন্ত সবকটি বাংলা বন্‌ধই ব্যর্থ। কারণ বামপন্থীরাই হোক আর কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেসই হোক; কেউই বন্‌ধ ডেকে নিশ্চিন্তে ঘরে বসে থাকেনি। তারাও শক্তি প্রদর্শনের মধ্য দিয়েই বড় হয়েছে। বামপন্থীদের উত্থানের পিছনে যেমন রয়েছে বাস-ট্রাম-পোড়ানো, সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি। কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেসের পিছনেও রয়েছে জঙ্গি আন্দোলন। যার বলি হয়েছে অজস্র মায়ের সন্তান আর স্ত্রীর স্বামী।

বিজেপি-র তাই হিন্দুবিদ্বেষী কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট লালিত-পালিত গণমাধ্যমগুলির দিকে তাকানোর কোনও প্রয়োজন নেই। শক্তি প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে তাদের রাজনীতির অলিন্দে জায়গা করে নিতে হবে। এছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই জনগণের আস্থা অর্জনের। জনগণের আস্থা অর্জনের মধ্য দিয়েই সংগঠন গড়ে উঠবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগোষ্ঠী মূলত ভীরু, কাপুরুষ; তাই তারা বীর পূজারী। বন্‌ধের আগেও যারা বলেছিল বিজেপির ক্ষমতা আছে যে বন্‌ধ সফল করবে? তারাই এখন বিজেপি সম্পর্কে সম্ভ্রমের

সঙ্গে কথা বলছে। নির্বাচনের সময় অনেক বিজেপি সমর্থককেও বলতে শুনেছি—বিজেপি-কে ভোট দিয়ে কি হবে, বিজেপি-র তো এখানে কোন ক্ষমতাই নেই ইত্যাদি, ইত্যাদি। এই হীনমন্যদের কাছে নীতি আদর্শটা কিছু নয়। ক্ষমতা প্রদর্শনই আসল কথা। তাই বিজেপি'-কে ক্ষমতা দেখাতে হবে। শুধু বন্‌ধ-এ নয়, সমস্ত কর্মসূচীতে। বাস-ট্রাম বন্ধ না করলে, না পোড়ালে যে সমাজে খবর হওয়া যায় না, সে সমাজ কি শেখাবে ভদ্র, শান্ত, নির্বিষ, অহিংস মানব সংগঠনকে? যে রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীগণ মারমুখী জঙ্গি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে খোলাখুলি তোষামোদ করে, বামুনের মেয়ে হয়ে বোরখা পরে ইদের নমাজ পড়ে, তাদের পক্ষে ইসলামী জঙ্গিদমন কখনই সম্ভব নয়।

এ কাজ সংগঠিত হিন্দুদেরই করতে হবে। কারণ এদেশের সমাজ, সংস্কৃতি তাদেরই জাতিসত্তার অঙ্গ। এই মহান সংস্কৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত এই জাতিসত্তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিতে হবে হিন্দু সংগঠনকে। আর সেটা বিজেপি'কে খোলাখুলি বলতে হবে আর করতেও হবে। তাই প্রয়োজন শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মজবুত সংগঠন যা হবে ঈশ্বরের মতই সর্বশক্তিমান ও সর্বত্র বিরাজমান। বিজেপি'র রাজ্য নেতৃত্বে নবীন প্রজন্ম এগিয়ে আসুক। নেতৃত্বের অসততা নিয়ে যার চিন্তিত তাদের মনে করিয়ে দিই সঙ্ঘের (আর এস এস) নিবর্তমান সরসঙ্ঘচালক সুদর্শনজীর মূল্যবান দিগ্‌দর্শন ঃ কূয়া খননের আগে কেউ জল শোধন করে না। আগে পর্যাপ্ত কূয়া খনন করা হোক; তারপর জল শোধন করা যাবে।

শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুরহস্য

(১ পাতার পর)

লকআপে অথবা জেল হেফাজতে কোনও বন্দির মৃত্যু হলে মৃত্যুর কারণ এবং দোষীদের চিহ্নিত করতে নিরপেক্ষ তদন্ত বাধ্যতামূলক। ডঃ মুখোপাধ্যায়ের রহস্যজনক মৃত্যুর পর এই আইনগত দায়িত্ব পালন করা হয়নি কেন?

চলতি বছরের ১২ মে এইসব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তথ্য জানার অধিকার আইনের ধারায় ফোরাম তুলেছিল কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের কাছে। কোনও লাভ হয়নি। কমিশনের পক্ষ থেকে লিখিতভাবে জানানো হয় যে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের জেল হেফাজতে মৃত্যুর যাবতীয় নথিপত্র 'কঠোরভাবে গোপনীয়' এবং তা দেওয়া যাবে না বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে। এরপরেই রাষ্ট্রীয় লিগাল এইড ফোরাম সুপ্রিম কোর্টে সংবিধানের ৩২নং অনুচ্ছেদে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ফোরামের স্পষ্ট বক্তব্য, ডঃ মুখোপাধ্যায় একজন ভারত বরেণ্য দেশপ্রেমিক নেতা ছিলেন। তাঁর রহস্যজনক মৃত্যুর প্রকৃত তথ্য জানার মৌলিক অধিকার ভারতবাসীর আছে। ভারত সরকারের তা গোপন রাখার নৈতিক এবং আইনি অধিকার নেই। দেশের নাগরিকদের জানার অধিকার আছে যে ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর কারণ হার্ট অ্যাটাক অথবা তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল।

১৯৫৩ সালের ১১ মে ডঃ মুখোপাধ্যায় কাশ্মীর যান এবং গ্রেফতার হন। তাঁর যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল কাশ্মীরকে 'স্পেশাল স্ট্যাটাস' দেওয়ার বিরোধিতা করা। প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে কাশ্মীরের জন্য পৃথক পতাকা হবে। কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হবে। কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি ছাড়া সে রাজ্যে ভারতের রাষ্ট্রপতিরও প্রবেশাধিকার থাকবে না। ডঃ মুখোপাধ্যায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়তে চেয়েছিলেন। তাঁর স্লোগান ছিল, 'এক দেশ মে দো বিধান, দো প্রধান, দো নিশান নহি চলেগা'। এরপর বিনা বিচারে বন্দি থাকাকালে ২৩ মে, ১৯৫৩ তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রহস্যজনক মৃত্যুর নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলন হয়। এমনকী, ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মাতা যোগমায়া দেবী নিজে চিঠি লিখে জহরলাল নেহরুকে তদন্তের অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। কিন্তু নেহরু কোনও রকম তদন্তের দাবি মানেননি। কেন? ডঃ মুখোপাধ্যায়কে হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আড়াল করতেই কি তিনি তদন্তে রাজি হননি? অথবা জনরোষ থেকে নিজেকেই বাঁচাতে?

সব প্রশ্নের জবাবের জন্য এখন আমাদের সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

নেপাল থেকে নাগাল্যাণ্ড

(১ পাতার পর)

চুপ। মুখমন্ত্রী বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য নিয়ম করে বলেছেন, তৃণমূলের সঙ্গে নাকি মাওবাদীরা যুক্ত। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন, কেন সিপিএমের সঙ্গে নয়? সীতারাম-প্রচণ্ড বৈঠক কি কোনও রকম যোগাযোগের কথা বলে না? কিছুদিন আগে অসিত সরকার নামে এক মাওবাদী নেতা পশ্চিম মেদিনীপুরে খুন হয়েছে। তার সঙ্গে মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষের সম্পর্ক দিনের আলোর মতই স্পষ্ট ছিল। এই অসিত সরকারদের মন্ত্রী সুশান্ত ঘোষ ওই চত্বরে তৃণমূল-বিজেপিকে সরাতে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরম ঠিক কথাই বলেছেন, সিপিএম এতদিন কংগ্রেস, বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মাওবাদীদের প্রতি নরম মনোভাব নিয়েছে। তাদের সমর্থন দিয়েছে। এখন মাওবাদীরা বুদ্ধ দেবের জীবন ওষ্ঠাগত করায় সিপিএমের কাছে মাওরা শত্রু হয়েছে।

রাজ্য রাজনীতি

পদত্যাগ-এ বিশ্বাস করেন না বুদ্ধ দেববাবুরা

নিশাকর সোম

সম্প্রতি পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে এক জনসভায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আবার হুঙ্কার দিয়েছেন — "ওরা যদি আক্রমণ করে, আমরাও করবো। আত্মসমর্পণ নয়, মাথা তুলে দাঁড়াবো।" এ তো শূন্য কলসের আওয়াজ! এরপরই একাধিক স্থানে মাওবাদীদের আক্রমণে সি পি এমের পার্টি অফিস জ্বলেছে এবং একাধিক কর্মী নিহত হয়েছেন। বুদ্ধ বাবু যখনই হুঙ্কার ছাড়েন, তারপরই খুন-খারাপি বেড়ে যায়। বুদ্ধ বাবু জানেন না, পার্টির নিচের তলার কর্মীরা তাঁর এই আস্ফালনকে পরিহাস করে বলেন, "ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার।" তাঁরা আরও বলেন, "ভাঙা রেকর্ড বাজিয়ে চলেছে। বুদ্ধ বাবুর বক্তৃতা কাউকে উদ্বুদ্ধ করছে না।"

প্রসঙ্গত, শুদ্ধি করণ সম্বন্ধে নিচের তলার কর্মীদের মনোভাব হল, শুদ্ধি করণ ওপর থেকেই শুরু হোক। পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও তাঁর স্ত্রী লণ্ডন ঘুরে এলেন। তাতে কোনও সমালোচনা নেই। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্স সম্মেলনের প্রতিনিধিদের জন্য কোটি টাকা ব্যয় হল। এ টাকা এলো কোথা থেকে? এদিকে নিচের তলার কমরেড কোনও বিলাস দ্রব্য কিনলে বা গাড়ি কিনলে, সিডি কিনলে, এসি কিনলে বলা হয় পার্টিবিরোধী। আসলে নিয়মের চাপ নিচের তলায়। ওপরতলায় চলছে বৈভব-বিলাস। এ প্রসঙ্গে মনে হড়ে যাচ্ছে, সি পি এমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদর দপ্তর যখন কলকাতায় ছিল, তখন বি টি রণদিভে অ্যাটর্নি অজয় দাশের বাড়িতে থাকতেন। অজয় দাশের বাড়ির একজন বাসিন্দা বলেছিলেন, রণদিভে ইলেকট্রিক সেভিং যন্ত্র দিয়ে সেভ করেন। সেটা দেখে ওই বাসিন্দা সি পি এমে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। তিনি আরও বলেছিলেন, অন্যান্য পলিটব্যুরোর সদস্যরা রাজা-মহারাজার মতোই থাকেন। আজও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। বুদ্ধ বাবু তো দামি সিগারেট খান। ধূমপান ছাড়বেন না বলে ঘোষণাও করেছেন। আসলে নিচের তলার কমরেডদের শুদ্ধি করণের নামে ব্যক্তিগত জীবনকে টাইট করে দেওয়া হচ্ছে।

> **ব্যর্থতার দায়ভার মাথায় নিয়ে বুদ্ধ-বিমান জনতার কাছ থেকে মার্জনা ভিক্ষা করে যদি পদত্যাগ করতেন, তাহলে শুধু জনগণ নয়, তাঁদের পার্টির নিচের তলার কর্মীদেরও সহানুভূতি পেতেন।**

ফলে রাজ্য সি পি এমের নিচের তলার কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে। তাঁরা অনেকে পার্টির এই দু'রকমের ইয়ার্ডস্টিক দেখে বসে যাচ্ছেন অথবা পার্টি সভ্যপদ নবীকরণ না করার দিকে এগোচ্ছেন। এঁদের মধ্যে উৎসর্গীকৃত কর্মীর সংখ্যাই বেশি।

এদিকে ফরওয়ার্ড ব্লকের বিভিন্ন জেলা সম্মেলনগুলিতে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে, তাতে কেবলমাত্র সি পি এম দলের নেতৃত্বের তথা মন্ত্রীদের তীব্রতম সমালোচনা ধবনিত হয়েছে। এই সমালোচনাতে প্রাক্তন মন্ত্রী সরল দেব সহ বহু নেতা গলা মিলিয়েছেন। এই সব প্রতিবেদনের বক্তব্য হলো, বুদ্ধ দেববাবুর নির্দেশে সাধারণ কৃষক আদিবাসীদের ওপর ফ্যাসিস্ট কায়দায় হিংস্র আক্রমণ করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গ সহ আদিবাসী অঞ্চ লে কোনও উন্নয়নের কাজ হয়নি। আদিবাসীদের ন্যূনতম বাঁচার ব্যবস্থা নেই, নেই স্বাস্থ্য পরিষেবা। নেই শিক্ষার উদ্যোগ। প্রতিবেদনের বক্তব্য, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যাপারে মন্ত্রীগণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ। ফলে আদিবাসী জনতার দাবী নিয়ে জনসাধারণের কমিটি ও তার নেতারা আন্দোলন করাতে জনগণের ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছেন। আরও বলা হয়েছে, টাটাদের কম দামে (নামমাত্র মূল্যে) জমি দেওয়া হয়েছে কৃষকদের মেরে। টাটার সঙ্গে যে গোপন চুক্তি আছে, তা অদ্যাবধি বামফ্রন্টে পেশ করা হয়নি। বুদ্ধ বাবু-নিরুপম সেন টাটাদের সঙ্গে মাখামাখি করেছিলেন কেন? কিসের স্বার্থে, তাতে রাজ্যের কি স্বার্থ রক্ষা হয়েছে? না শোষকদের সঙ্গে শাসক এক হয়ে গাঁটছড়া বেঁধেছে?

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বুদ্ধ বাবু-নিরুপম সেন সব কথাই গোপন রাখেন কেন? নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সেখানকার ঘটনার ফলে রাজ্যের বামফ্রন্টের ক্ষতি করা হয়েছে। পক্ষান্তরে তৃণমূলকে শক্তিশালী হতে সাহায্য করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, সি পি এম কর্মী লালু আলম মমতা ব্যানার্জীকে ডাণ্ডা দিয়ে মেরে বিখ্যাত করে তুলতে সাহায্য করেছিল— এ তো এজেন্ট প্রভোকেটারের কাজ।

সি পি এম দল আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত। সি পি এমের গ্যাংগ্রিন হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই কলামে বহু আগেই এই মন্তব্য লেখা হয়েছিল। বর্তমানে শুধু ফরওয়ার্ড ব্লক নয়, বামফ্রন্টের সমস্ত শরিক দলেরই এই মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ ব্যক্ত করেনি। কিন্তু আর এস পি নেতা তথা মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামী প্রতিটি বক্তব্যে সি পি এম এবং মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেছেন। বস্তুত, সি পি এমের লাজলজ্জা থাকলে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যানশিপ ছেড়ে দিয়ে রাজ্যের বামদলগুলির মধ্যে প্রবীণতম নেতা অশোক ঘোষকে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান করা উচিত ছিল।

গত বুধবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এক দূরদর্শনের চ্যানেলে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তাঁর পদত্যাগের প্রশ্নটির উত্তরে বলেছেন, "আমি ক্ষমতা ভোগ করতে চাই না। নৈতিকতা বাদ দিয়ে রাজনীতি করা যায় না। কিন্তু নৈতিক অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক দায়িত্ববোধের কথা ভেবেছি। দায়িত্ববোধ ছেড়ে দিতে পারি না। কোটি কোটি মানুষের জন্য আমি পদত্যাগ করতে চাই না। নিজের দায়িত্ব শেষপর্যন্ত পালন করতে চাই।"

বুদ্ধ বাবু যখন মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন, "পলিটিক্স ইজ দ্য লাস্ট রিসর্ট অফ রাস্কেল।" এই কথার সঙ্গে বুদ্ধ বাবুর দূরদর্শনের সাক্ষাৎকার তুলনীয়। বুদ্ধ বাবু বোধহয় জানেন না, তাঁর পার্টির নিচের তলার কর্মীরা তাঁকে ফোঁপরা ঢেঁকি বলে থাকেন। তিনি ২০১১ সালে ঘুরে দাঁড়াবার স্বপ্ন দেখছেন। পার্টির নিচের দলার কর্মীদের সে প্রত্যয় নেই, একথা তো বিমান বসু স্বীকারই করেছেন। বিমান বসু আরও বলেছেন, "আমরা প্রত্যয় সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছি।" যেদিন বুদ্ধ বাবু দূরদর্শনে তাঁর কথা প্রচার করছিলেন, সেদিনই বিমানবাবু বলেছেন, পঞ্চ ায়েত এবং পুরসভা স্তরে আমরা ক্ষমতাসীন বা বিরোধী হয়েও কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছি। বুদ্ধ বাবু নিজে বলেছেন, স্বাস্থ্য ও পঞ্চ ায়েতের কাজেও ব্যর্থ হয়েছি। তিনি যেটা বলেননি তা হলো, পুলিশ প্রশাসনেও তিনি ব্যর্থ। এতগুলি ব্যর্থতা নিয়ে বুদ্ধ বাবু ও বিমানবাবু লজ্জার মাথা খেয়ে কেন ক্ষমতা আঁকড়ে আছেন? ব্যর্থতার দায়ভার মাথায় নিয়ে বুদ্ধ-বিমান জনতার কাছ থেকে মার্জনা ভিক্ষা করে যদি পদত্যাগ করতেন, তাহলে শুধু জনগণ নয়, তাঁদের পার্টির নিচের তলার কর্মীদেরও সহানুভূতি পেতেন। এখন ২০১১ সালে পাবেন শুধু নিন্দা, ধিক্কার। কালের যাত্রার ধবনি শুনিতে কি পাও?

তৃণমূল নেত্রী রেলমন্ত্রী হয়েই রেলের নানা কমিটি করেছেন আর সেইসব কমিটিতে তাঁর অনুগামী— অনুরাগী সুশীল সমাজকে আর্থিক পুনর্বসতি দিয়েছেন। ২০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা বেতন। ফার্স্ট ক্লাসে গাড়িতে সপরিবারে ঘোরার সুযোগ, টেলিফোন ইত্যাদি যাবতীয় সুযোগের ব্যবস্থা করেছেন। এর প্রতিবাদে মমতার এক প্রিয় পত্রিকাও সমালোচনা করেছে।

আরও জানা গেল, মমতা অনুরাগী অনুগামী শিল্পী নচিকেতাকে রেলের অনুষ্ঠানের জন্য ৭০ হাজার টাকা এবং পল্লব কীর্তনীয়াকে ৫০ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়েছে। একে নেপোটইজম বলা যায় কি? এইসব টাকা দিয়ে কি রেলের নিরাপত্তা বৃদ্ধি র জন্য ব্যবস্থা করা যেতে পারতো না?

মমতা ব্যানার্জী বলেছেন, "বেশ করেছি, একশোবার করবো।" বাঙালী জাগো! মমতা আর সি পি এমের তফাৎটা তাহলে কোথায়!

রকম

অপ্রত্যাশী

সেই কবে কবিগুরু একবার লিখেছিলেন— "আমি নারী, আমি মহীয়সী, আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণার নিদ্রাবিহীন শশী।" আর শরৎ চাটুজ্জে মশাইয়ের বরাবরের আক্ষেপ— "সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই।" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়— নারীকে তাঁরা যে চোখে দেখতেন, কোনও মানবীর

মাণ্ড্য জেলা কালেক্টরের সঙ্গে কৃতী নবরত্না মহিলাবৃন্দ।

পক্ষেও সেই দৃষ্টিকে অতদূর প্রসারিত করা সম্ভবপর কিনা তা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। যে বিতর্ককে ইন্ধন যুগিয়ে রবিঠাকুর সাধারণ মেয়ের জন্য তাঁর শরৎবাবুকে একটা গল্প লিখতে বলেছিলেন। শরৎবাবু সেই গল্প লিখতে পারেননি। তবে তাঁরা দু'জনেই জানতে পারলে খুশি হতেন, কর্ণাটকে মাণ্ড্য বলে একটি জেলা আছে। যেখানে কর্ণাটক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস-এর নিজেদের জন্য অপ্রত্যাশী ন'জন মহিলা অবিরত মানুষের সেবায় রত রয়েছেন।

তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়টুকু এখানে বিশেষ আবশ্যক। প্রথমা, কবিতা রাজারাম। একদা ইংরেজির অধ্যাপিকা ছিলেন। এখন মাণ্ড্য মহকুমায় তহবিলদারের ভূমিকায় রয়েছেন। দ্বিতীয়া, আর লাথা। ইতিপূর্বে ব্যাঙ্ক অফিসার ছিলেন। বর্তমানে মাণ্ড্যর সহকারী কমিশনার পদে নিযুক্ত রয়েছেন। তৃতীয়া, আর মেঘানা। এঁর বিশেষত্ব, এই মহিলা দলে ইনি কনিষ্ঠতমা। বয়স মাত্র ২৪ বছর। কলাবিভাগে স্নাতক। নির্বাচনী কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন আপাতত। চতুর্থা, ৩৪ বছর বয়সী মালাভাল্লি ব্লকের তহবিলদার ধনলক্ষ্মী। পঞ্চ মা, ২৯ বছর বয়সী কুমুদা গিরীশ। ইনি খাদ্য ও অন্যান্য সামাজিক সরবরাহের ভারপ্রাপ্ত উপ-আধিকারিক। ষষ্ঠা, শ্রীরঙ্গপাটনার তহবিলদার আর. কবিতা রাণী। সপ্তমা, বি আর পূর্ণিমা। ইনি পাণ্ডবপুরার সহকারী কমিশনার। অষ্টমা, আর সুমা। ইনি পেশায় আইনজীবী। বলা ভাল, আইনকে একদা ইনি জীবিকা করেছিলেন। বর্তমানে ডকুমেন্টারি ছবি তৈরির মতো সৃষ্টিশীল কাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছেন। নবমা, ভি আর শৈলজা। ২৯ বছর বয়সী এই ভদ্রমহিলা আগে ভূগোলের অধ্যাপিকা ছিলেন। আপাতত পাণ্ডবপুরার তহবিল সামলাচ্ছেন।

এঁদের সর্বশেষ পরিচয় মিলল। তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার, পেশাগত সীমাবদ্ধতার কারণে কবিতা রাজারাম, আর লাথা, আর সুমা, ভি আর শৈলজা নিজেদের স্ব-স্ব পেশা ত্যাগ করে প্রশাসনিক কর্মে নিযুক্ত হয়েছেন শুধুমাত্র মানুষের সেবা করবেন বলে। ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে কুখ্যাত কংগ্রেস কাউন্সিলার জাদেজা রবির খুনের পর যে নৃশংস দাঙ্গার সাক্ষী হয়েছিল মাণ্ড্য জেলা, তখন সেখানকার মানুষের পাশে অসম সাহসিকতার সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন কবিতা। উল্লেনহাল্লিতে জাতপাতকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এই নারী হলেন লাথা। হেমাবতী নদীর তীর থেকে চুরি যাওয়া বালির খোঁজে রত নারীর নাম সুমা। আর স্থানীয় রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামী শৈলজা ব্যাঙ্গালোরের পূর্বে মাগাদি-তে রেল স্টেশন করিয়েই ছেড়েছেন।

নয় নারীর অমর রূপকথার সাক্ষী হয়েছিলেন জেলা কালেক্টর এন মঞ্জুনাথ প্রসাদ। যাঁর কথায়, "মাণ্ড্য অবিকল সমগ্র ভারতেরই মতো। এর মধ্যে বৈচিত্র রয়েছে, রাজনৈতিক একটা পটচিত্রও আছে। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়েও পুরোপুরি সফল তাঁরা"।

বাংলাদেশে মুজিবর রহমান হত্যাকাণ্ড

৩৪ বছর পর হত্যাকারীদের ফাঁসির আদেশ

বিশেষ সংবাদদাতা।। ঢাকা ঃ বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ঐতিহাসিক রায় ঘোষিত হয়েছে। সেই রায়কে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে সন্তোষ প্রকাশ করে বিবৃতি অব্যাহত। রায়ের সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি এসব বিবৃতিতে সমবেদনা প্রকাশ করা হয়েছে বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি। রায় কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে সোচ্চার হবারও আহ্বান জানিয়েছেন বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এক যুক্ত বিবৃতিতে সভাপতি চিত্রাভিনেতা মাসুদ পারভেজ সোহেল রানা ও সাধারণ সম্পাদক পরিমল ঘোষ রঞ্জিত বলেছেন, ৩৪ বছর পর ঘোষিত এই রায় গোটা জাতির জন্য স্বস্তি বয়ে এনেছে। বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের সভাপতি প্রযুক্তিবিদ আকম ইসাহা কবীর বলেছেন, এই রায় কার্যকরের মাধ্যমেই জাতির ৩৪ বছরের পুরনো পাপ মোচন সম্ভব।

বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায় কার্যকর করার দাবি জানিয়ে সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু এভিনিউস্থিত আওয়ামী লীগের প্রধান কার্যালয় এলাকায় সমাবেশ ও মানববন্ধন করেছে আওয়ামী লীগ সমর্থক ৮টি সংগঠন। এগুলো হল, আওয়ামী হকার্স লীগ, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, ৭৫এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, মুক্তিযোদ্ধা লীগ, শহীদ নূর হোসেন সংঘ, মুক্তিযোদ্ধা জনতা লীগ, বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগ, বঙ্গবন্ধু নাগরিক সংহতি পরিষদ। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগের শ্রমবিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান সিরাজ। রায়কে স্বাগত জানিয়ে খ্রীস্টান এসোসিয়শনের প্রেসিডেন্ট সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী প্রমোদ মানকিন ও মহাসচিব নির্মল রোজারিও যুক্ত বিবৃতিতে বলেছেন, দেশের সর্বোচ্চ আদালত জাতির প্রত্যাশা পূরণ করেছে।

এই রায়ের মাধ্যমে। এদেশে আটক খুনীদের বিচারের পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত বিদেশে পলাতক ঘাতকদের ফিরিয়ে এনে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করুক। বঙ্গবন্ধু শিল্পী গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছেন সভাপতি কণ্ঠশিল্পী মাহাবুব রিয়াজ ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল রিপন। এছাড়াও বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার রায়কে স্বাগত জানিয়ে বিবৃতি জ্ঞাপন করেছে নানা কমিটি ও সংগঠন।

স্বাধীন বাংলাদেশের জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট। ঘটনার ৩৪ বছর পর নিষ্পত্তি হল সেই জঘন্য ও বর্বর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দায়ের করা মামলার। কিন্তু এরই মধ্যে ঘটে গেছে নানা ঘটনা। জারি করা হয় ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ। বন্ধ করা হয়েছিল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথ। এছাড়া রয়েছে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিদের বিব্রতবোধ। এক নজরে সেইসব ঘটনা :

২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ : ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়। খন্দকার মোশতাক সরকার এই অধ্যাদেশ জারি করে। উদ্দেশ্য ছিল এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার না করা। ১২ আগস্ট ১৯৯৬ : বিশেষ ক্ষমতা আইনে আসামি লে. কর্নেল (অব:) ফারুকসহ ৩ জনকে আটক করা হয়। ২ অক্টোবর ৯৬ : হত্যাকাণ্ডের ২১ বছর পর বঙ্গবন্ধুর রিসেপসনিস্ট-কাম-রেসিডেন্ট পি এ মুহিতুল ইসলাম বাদী হয়ে ধানমণ্ডি থানায় মামলা দায়ের করেন। ১২ নভেম্বর ৯৬ :

(উপরে) বিচারকদের সাংবাদিক সম্মেলন। (নীচে) হত্যাকারীদের কয়েকজন।

আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল করে। উন্মুক্ত হয় বিচারের পথ। ২৮ জানুয়ারি ১৯৯৭ : ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে আসামি ফারুক রহমান ও শাহরিয়ার রশিদ খানের আবেদন হাইকোর্টে না-মঞ্জুর হয়। ১৫ জানুয়ারি ৯৭ : ২৪ জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যবিধির ১২০(বি) দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ এবং ২০১ ধারায় মামলার চার্জশিট দাখিল করা হয়। ২০ জানুয়ারি ৯৭: আদলতে গ্রেফতার করা আসামিদের হাজির করা হয়। ২৮ জানুয়ারি ৯৭ : ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিলের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে করা রিটের রায় ঘোষিত। উক্ত অধ্যাদেশ বাতিলকে বৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্ট। ৩ ফেব্রুয়ারি ৯৭ : দেশ থেকে পলাতক আসামিদের নামে গেজেট নোটিফিকেশন জারি। ১ মার্চ ৯৭: ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের পাশে বিশেষ আদালত গঠন করা হয়। বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন কাজী গোলাম রসুল। সরকার পক্ষের বিশেষ পিপি ছিলেন সিরাজুল হক। ১২ মার্চ ৯৭ : চার আসামি মারা যাওয়ায় ২০ জনের বিরুদ্ধে বিশেষ এজলাসে বিচার কাজ শুরু হয়। ৭ এপ্রিল ৯৭ : ২০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ (চার্জ) গঠন করা হয়। ৬ জুলাই ৯৭ : ৬১ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা শুরু হয়। ২ এপ্রিল ১৯৯৮ : ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল বৈধ সংক্রান্ত হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ফারুক রহমান ও শাহরিয়ার রশিদ খানের আপিল সুপ্রিম কোর্টে খারিজ। ২০ জুলাই ১৯৯৮ : সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ। ১২ আগস্ট ৯৮ : সাক্ষীদের জেরা শুরু। ১৩ অক্টোবর ৯৮ : জেরা শেষে রায় দানের তারিখ ঘোষণা। ৮ নভেম্বর ৯৮ : আসামি বজলুল হুদাকে ব্যাংকক থেকে দেশে ফেরত আনা হয়। ১৫৫ কার্যদিবস শেষে ওইদিন মামলার রায় ঘোষণা করা হয়। মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় ১৫ জনকে। ১১ নভেম্বর ৯৮ : আসামিদের মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিতকরণের জন্য হাইকোর্টে ডেথ রেফারেন্স পাঠানো হয়। ৩০ মার্চ ২০০০ : বন্ধবন্ধু হত্যা মামলার ডেথ রেফারেন্স ও নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আসামিদের আপিল শুনানির জন্য হাইকোর্টের কার্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। ১০ এপ্রিল ২০০০ : ডেথ রেফারেন্সের শুনানিতে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চের বিচারপতি বিব্রতবোধ (বিচারপতি আমিরুল কবীর)। ১৮ এপ্রিল ২০০০ : সরকারের কয়েকজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে হাইকোর্টের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের লাঠি মিছিল। ২৪ এপ্রিল ২০০০ : হাইকোর্টের অপর একটি বেঞ্চের বিচারপতির বিব্রতবোধ (বিচারপতি এমএম রুহুল আমিন ও বিচারপতি আব্দুল মতিন)। ২ মে ২০০০ : পলাতক আসামিদের পক্ষে স্টেট ডিফেন্স নিয়োগ। ৩ মে ২০০০ : সংশোধিত পেপার-বুক তৈরির আবেদন নাকচ করে সম্পূরক পেপার-বুক তৈরীর নির্দেশ। ২৮ জুন ২০০০ : হাইকোর্টে ডেথ রেফারেন্সের শুনানি শুরু। ১০ জুলাই ২০০০ : সম্পূরক পেপার-বুক হাইকোর্টে দাখিল। ১৮ জুলাই ২০০০ : হাইকোর্টে সওয়াল-জবাব শুরু। ২২ অক্টোবর ২০০০ : আসামি পক্ষের কৌঁসুলিদের বক্তব্য প্রদান শেষ ও সরকার পক্ষের যুক্তি শুরু। ২৮ নভেম্বর ২০০০ : আপিল ও ডেথ রেফারেন্সের শুনানি গ্রহণ শেষ। ১৪ ডিসেম্বর ২০০০ : ৬৩ কার্যদিবস শুনানি শেষে হাইকোর্টের দ্বিধা বিভক্ত রায় ঘোষণা। বিচারপতি এমন রুহুল আমিন ১০ জনকে এবং বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক ১৫ জনের ফাঁসির আদেশ বহাল রাখেন। ১৪ জানুয়ারি ২০০১ : হাইকোর্টের দ্বিধাবিভক্ত রায় নিষ্পত্তির জন্য নথি প্রধান বিচারপতির কাছে প্রেরণ। ১৫ জানুয়ারি ০১ : বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিমকে হাইকোর্টের তৃতীয় বিচারপতি নিয়োগ। এরপর দ্বিধাবিভক্ত রায় নিষ্পত্তির জন্য নথি তৃতীয় বিচারপতির কাছে প্রেরণ। ১৭ জানুয়ারি ০১ : তৃতীয় বিচারপতি শুধু দ্বিমত থাকা আসামিদের বিষয়ে শুনানি করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। ২৪ জানুয়ারি ০১ : লে. কর্নেল মহিউদ্দিন আহম্মদের (আর্টিলারি) স্ত্রী শাহিদা মহিউদ্দিন ডিমান্ড অব জাস্টিস নোটিস পাঠান। ১২ ফেব্রুয়ারি ০১ : তৃতীয় বিচারপতির আদালতে দ্বিধাবিভক্ত রায়ের বিষয়ে শুনানি শুরু। ১৯ এপ্রিল ০১ : শুনানি গ্রহণ শেষ। ৩০ এপ্রিল ০১ : তৃতীয় বিচারপতি ১২ আসামির মৃত্যুদণ্ড বহাল রেখে ৩ জনকে খালাস করে দেন। হাইকোর্টের চূড়ান্ত রায়ে মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকা ১২ আসামির মধ্যে পরে ওই বছরই কারাবন্দী চার আসামি আপিল বিভাগে লিভ টু আপিল দায়ের করে। ১৩ মার্চ, ০৭ : মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপর আসামি এ কে এম মহিউদ্দিন (ল্যান্সার) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রেফতার। ১৮ জুন ০৭ : মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ল্যান্সার মহিউদ্দিনকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। ২৪ জুন ০৭ : হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে ল্যান্সার মহিউদ্দিনের আপিল পেশ। ২০ আগস্ট ০৭ হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আসামিদের দায়ের করা লিভ টু আপিল শুনানির জন্য বেঞ্চ গঠন। ৭ আগস্ট ০৭ : বিচারপতি এম তাফাজ্জল ইসলামের নেতৃত্বে বিচারপতি মোঃ জয়নাল আবেদিন ও বিচারপতি মোঃ হাসান আমিনকে নিয়ে আপিল বিভাগের বিশেষ বেঞ্চ গঠন এবং লিভ টু আপিলের ওপর শুনানি গ্রহণ শুরু। ২৩ সেপ্টেম্বর ০৭ : ২৬ কার্যদিবসব্যাপী শুনানি গ্রহণ করে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পাঁচ আসামির আপিল শুনানির জন্য ৫ আসামির লিভ মঞ্জুর করা হয়। ৩০ অক্টোবর ০৭ : আসামি পক্ষ পেপারবুক ও মামলার সারসংক্ষেপ আদালতে জমা দেয়। ২৩ আগস্ট ০৯ : সরকার পক্ষ মামলার সারসংক্ষেপ আপিল বিভাগে জমা দেয়। ২৪ আগস্ট ০৯ : আপিল বিভাগের চেম্বারে বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেন বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আপিল শুনানির জন্য ৫ অক্টোবর দিন ধার্য করে দেন। ৪ অক্টোবর ০৯ : ৫ আসামির নিয়মিত আপিল নিষ্পত্তির জন্য আপিল বিভাগের পাঁচ বিচারপতিকে নিয়ে বিশেষ বেঞ্চ গঠন। বিচারপতিরা হলেন : এম তাফাজ্জল ইসলাম, বিচারপতি মোঃ আব্দুল আজিজ, বিচারপতি বি কে দাস, বিচারপতি মোঃ মোজাম্মেল হোসেন ও বিচারপতি এস কে সিনহা। ৫ অক্টোবর ০৯ : সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আপিলের শুনানি শুরু। ১২ নভেম্বর ০৯ : ২৯ কার্যদিবসব্যাপী আপিলের ওপর শুনানি গ্রহণ করে চূড়ান্ত রায় দানের জন্য দিন ধার্য। ১৯ নভেম্বর ০৯ : বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা।

(ঘটনা পরম্পরা দৈনিক ইত্তেফাক-এর সৌজন্যে)

গগৈ-এর পদত্যাগের দাবী করলেন পাটোয়ারি

সংবাদদাতা ঃ রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার চূড়ান্ত অবনতি, গণহত্যার মতো ঘটনা ঘটায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা চন্দ্রকান্ত পাটোয়ারি। এক্ষেত্রে চন্দ্রকান্তর সাফ কথা—তরুণ গগৈ সরকারের দু'জন মন্ত্রীই নিরাপত্তার দাবীতে ধর্নায় বসেছেন।

এই দুই মন্ত্রীর হলেন—অসমের পরিবহনমন্ত্রী চন্দন ব্রহ্মএবং কৃষিমন্ত্রী প্রমীলা রানী ব্রহ্ম। গত ২০ নভেম্বর বড়োল্যাণ্ড পীপুলস্ ফ্রন্টের নেতা হাগ্রামা মহিলারির নেতৃত্বে দিসপুর গেটে সহস্রাধিক সমর্থকের সঙ্গে ধর্নায় ওই দুই মন্ত্রীও সামিল হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, বড়ো জঙ্গিগোষ্ঠী এন ডি এফ বি-সন্ত্রাসবাদীরা রাতের অন্ধকারে বেশ কয়েকজন সাধারণ মানুষকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করে নির্দয়ভাবে হত্যা করে অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে। ওই গ্রামটা হাগ্রামা মহিলারির নেতৃত্বাধীন বি টি এ ডি বা বড়োল্যাণ্ড টেরিটোরিয়াল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট-এর এলাকাধীন। ধর্নাস্থলে রাজ্য সরকারের মুখপাত্র ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং বনমন্ত্রী রকিবুল হাসান গিয়েছিলেন। তাদের হাতে বি পি এফ-এর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়। এ জি পি-র দাবী সরকারের মন্ত্রীরাই তো মুখ্যমন্ত্রীর দিকে আঙুল তুলেছেন। হাগ্রামার দাবী বি টি এ ডি এলাকা থেকে এন ডি এফ বি-র অবৈধ শিবির ভেঙে দিতে হবে। সন্ত্রাসবাদীদেরকে উদালগুড়ি,

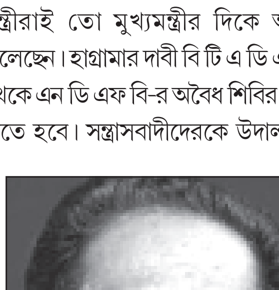

তরুণ গগৈ

কোকরাঝাড় ও বকসাতে নির্দিষ্ট শিবিরে আটক রাখতে হবে। অপরাধীদের নির্দিষ্ট করে শাস্তি দিতে হবে।

বোড়ো টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল এলাকার মধ্যে পুলিশের সংখ্যা অনেক কম। সেজন্য আরও বেশি সংখ্যায় পুলিশ এবং নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করারও দাবী জানানো হয়েছে। মহিলারি সরকারকে উলফা এবং এন ডি এফ বি উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। হাগ্রামা আবার জঙ্গিদেরকেও পূর্বশর্ত ছাড়াই শান্তিবার্তায় যোগ দিতে বলেছেন।

এদিকে মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ সংবাদ সংস্থা

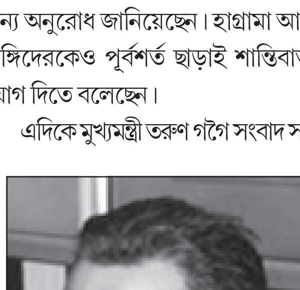

চন্দ্রকান্ত পাটোয়ারি

ইউ এন আই-কে বলেছেন, 'বি টি সি এলাকায় নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। সেজন্য হিংসা এড়ানো যাচ্ছে না।

রাজ্যের অন্যান্য এলাকার অবস্থাও একইরকম। ২০ নভেম্বর পর্যন্ত কয়েকদিনে বড়ো অধ্যুষিত এলাকায় কমপক্ষে আটজন খুন হয়েছে।

নাস্তিকের ভগবান মধ্যপ্রদেশ সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মধ্যপ্রদেশের বেতুল জেলায় নিজের গ্রাম সাঙ্গী থেকে ঘাড়ধাক্কা খেয়েছিলেন ভূপতি দাস ও তাঁর পরিবারবর্গ। পরিবারবর্গ মানে তাঁর স্ত্রী, তিন কন্যা ও এক পুত্র। এই দলিত পরিবারটির মুখ্য অপরাধ তাঁরা নাস্তিক। এই নাস্তিকতার প্রমাণও রীতিমতো জোরদার। ভূপতি দাস সন্ত কবীরপন্থী। সুতরাং ভগবানে যে সে বিশ্বাস করে না, এর চাইতে বড় প্রমাণ আর কিছু আছে নাকি? দ্বিতীয়ত, ভগবানে অবিশ্বাসী

মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং

যখন উপস্থিত তখন ভগবানের কোপ যে গ্রামের ওপর নেমে আসবেই, এটা স্বাভাবিক। আর হাতে পাঁজি মঙ্গলবার স্বরূপ আগস্ট মাসের বাইশ তারিখ এসে গেল, অথচ আকাশে মেঘের দেখা নেই! ভরা বর্ষার মরশুমে এই অলক্ষুণে কাণ্ডটি নির্ঘাত কালো মায়াজালের সাহায্যে ঘটিয়েছেন ভূপতি। সে যাই হোক, এইসব গুরুতর অপরাধের বোঝা মাথা নিয়ে গ্রাম থেকে বিতাড়িত ভূপতি উঠেছিলেন গ্রামেরই অদূরে এক বন্ধুর বাড়িতে। কিন্তু পাছে ভূপতির ছায়া ওই গ্রামে পড়ে, তাই বন্ধুগৃহ থেকেও বিতাড়িত হতে হলো তাকে। শেষপর্যন্ত ঠাঁই হলো বেতুল রেল স্টেশনে।

রেল স্টেশনে গৃহহারা ভূপতি আর তার পরিবারবর্গকে সর্বপ্রথম নজরে পড়ে ইংরেজি দৈনিক 'দ্য পাইওনিয়ার'-এর এক সাংবাদিকের। গত ৭ সেপ্টেম্বর ও ১৭ নভেম্বর এবিষয়ে দুটি প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয় দ্য পাইওনিয়ারে। মূলত ১৭ নভেম্বরের প্রতিবেদনের পরেই টনক নড়ে জেলা প্রশাসনের। বেতুল জেলার পুলিশ সুপার আর এল প্রজাপতি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ধর্মেন্দ্র সিং ভাদোরিয়া এবং মূলতাই মহকুমার পুলিশ আধিকারিক ভূপেন্দ্র সিং সেনগার যৌথভাবে ব্যবস্থা নিতে শুরু করেন। তাঁরা নিয়মিত যোগাযোগও রাখেন ভূপতির সঙ্গে। তাঁদের কাছে নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়েই শেষ পর্যন্ত দলিত যুবক ভূপতি সপরিবারে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। বেতুল-এর কালেক্টর সাহেব ডি এ কুরেল তড়িঘড়ি ৩৫ হাজার টাকার আবেদন মঞ্জুর করে দিয়েছেন, যাতে ভূপতি বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করতে পারেন। সেই সঙ্গে কুরেল সাহেব নগদ দু-হাজার টাকা, ২০ কেজি গম, ৫ কেজি চাল, ২ কেজি ডাল এবং তেল, নুন, মশলাপাতি কেনার জন্য আরও হাজারখানেক টাকা তুলে দেন ভূপতির পরিবারের হাতে।

স্রেফ খবরের কাগজের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পৃথিবীর ক'টা সরকার আর একজন নিতান্ত নগণ্য ব্যক্তির জন্য এতটা সদয় হতে পারেন? মধ্যপ্রদেশ সরকারের কৃতিত্বটা বোধহয় এখানেই।

পুনশ্চ : এই মুহূর্তে মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের বেতুল জেলায় মুলতাই মহকুমার সাঙ্গী গ্রামে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করছে। কারণ, তাদের ভুল বুঝতে পেরে দাস পরিবারের কর্তা-গিন্নী সহ চার ছেলেমেয়েকে সাদরে বরণ করে নিয়েছেন গ্রামবাসীরা।

কৃষিজমি রক্ষায় বিল আনছে ছত্তিশগড় সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি।। এবার থেকে বহিরাগতরা রাজ্যের কোনও জমিই কিনতে পারবেন না। ছত্তিশগড়ের রমণ সিং সরকার রাজ্যের বাইরের লোকেদের রাজ্যের জমি কেনা নিষিদ্ধ করতে রাজ্য বিধানসভার আগামী অধিবেশনেই বিল আনতে চলেছে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে সরকারই বিল পেশ করবে। ইতিপূর্বে মহারাষ্ট্রে এই ধরনের আইন বর্তমান। সেই আইনকে অনুসরণ করে ছত্তিশগড় সরকারও একই আইন বলবৎ করতে আগ্রহী। তবে খসড়াতেই বর্তমান সময়ের উপযোগী কিছু রদবদলও করা হবে। একথা মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রমণ সিং নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, রাজ্যের বাইরের অনেকেই বিনিয়োগের দৃষ্টিতে শত শত একর জমি কিনে নিয়েছেন এবং জমি কেনা চলছেই। সেক্ষেত্রে প্রস্তাবিত আইন পাস হলেই জমির কেনা-বেচা আটকানো যেতে পারে। প্রসঙ্গত, আমাদের দেশে অনেক রাজ্যেই জনজাতিদের সুরক্ষার দৃষ্টিতে বিশেষ অনুমতি ব্যতীত অনুসূচীত জাতি বা জনজাতিদের জমি ক্রয় করা যায় না।

শ্রীসিং জানিয়েছেন, কৃষি জমি বিনিয়োগ কারখানার জন্য ইচ্ছামতো জমি কেনা বা ভূ-মাফিয়াদের জমির দালালি করে টাকা কামানো একান্তই বন্ধ করা দরকার। আর যদি কেউ কারখানা বা শিল্প স্থাপনের জন্য জমি কেনেন, সেক্ষেত্রে জমির মালিক বা তার পরিবারের কারও কর্মসংস্থান হওয়া একান্ত আবশ্যক। কোনওক্রমেই কেবলমাত্র ক্রেতা লাভান্বিত না হন। জমি বিক্রি হলে বিক্রি বাবদ রাজস্বও সরকারের কোষাগারে জমা পড়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, জমির মালিক টাকার লোভে জমি বিক্রি করে দিচ্ছেন। আইন ব্যতিরেকে এটা আটকানো সম্ভব নয়।

এখানে উল্লেখ্য, বিগত বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এধরনের আইন প্রণয়ন করার। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাও বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসও প্রস্তাবিত

ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী রমণ সিং

আইনের পক্ষপাতী।

রাজ্য কংগ্রেস সভাপতি ধনেন্দ্র সাহু বলেছেন, কৃষিজমি রক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যে আইনের রক্ষাকবচ জরুরি। তবে সরকার পক্ষ বিধানসভায় বিল উত্থাপন না করা পর্যন্ত আইনের পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত দেওয়া সম্ভব নয়।

ওড়িশায় কোটি কোটি টাকার খনি কেলেঙ্কারি

সিবিআই তদন্তের দাবী খারিজ নবীন -সরকারের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। রাজ্যে বহু কোটি টাকার খনি কেলেঙ্কারি নিয়ে সি বি আই তদন্তের ব্যাপারে বিরোধীদের দাবী আরও একবার খারিজ করে দিল ওড়িশার নবীন পট্টনায়ক সরকার। সরকারের খনি-ইস্পাত

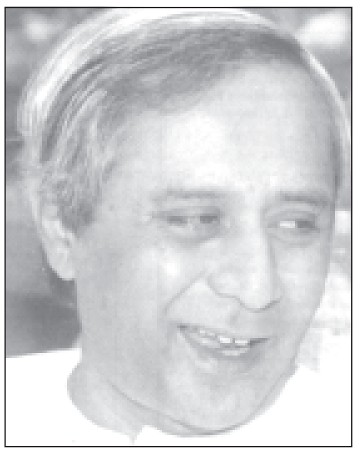

নবীন পট্টনায়ক

ও শিল্পমন্ত্রী রঘুনাথ মোহান্তির বক্তব্য, "খনি ইস্যুতে রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগের ভূমিকা সন্তোষজনক। সেই কারণে এর তদন্তভার সি বি আইয়ের হাতে তুলে দেবার আর কোনও প্রয়োজন নেই।"

ওড়িশা বিধানসভায় বিরোধীদের তোপের মুখে পড়ে মোহান্তি সি বি আই তদন্তকে 'অনভিপ্রেত ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলেও মন্তব্য করেন। ওড়িশা বিধানসভার প্রধান বিরোধী দলের মুখ্য সচেতক হরিচন্দন এই খনি কেলেঙ্কারিকে শতাব্দীর সেরা কেলেঙ্কারি বলে অভিহিত করে দাবী করেন, "যখন অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার খনি-দুর্নীতির জন্য সি বি আই তদন্তের ব্যাপারে প্রস্তাব দিয়েছিল, তখনই ওড়িশা সরকার ভ্রূকুঁচকে সেই প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছিল।" বিরোধীরা মনে করছেন, 'কলিঙ্গ টিউব' কাণ্ডে বিজু পট্টনায়ক যদি সি বি আই তদন্তের সাহস দেখাতে পারেন, তবে তার ছেলে হয়ে নবীন কেন সেই সাহসিকতার পরিচয় দিতে পারছেন না? তবে কি সত্যিই খনি কেলেঙ্কারিতে কোনওভাবে জড়িয়ে গিয়েছেন নবীন পট্টনায়ক সরকার? বিরোধীদের আরও আশ্চর্য করেছে, ২০০০ সালে নবীন পট্টনায়ক যেখানে সব অভিযোগই সি বি আইয়ের হাতে সমর্পণ করতে এক পায়ে খাড়া ছিলেন। এক দশকের মধ্যে এমন কি ঘটনা ঘটল যার জন্য সি বি আই তদন্তে এত অনীহা তাঁর?

ওড়িশা বিধানসভায় বিজেপির দলনেতা কে ভি সিংদেও বলেছেন, তদন্তের সময় এই জিনিসটা দেখা উচিত যে, যখন খনি-দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছিল, তখন কর্ণাটকের খনি সচিব কে ছিলেন। যাই হোক, যতদিন যাচ্ছে একটা জিনিস ততই স্পষ্ট হচ্ছে, এই দুর্নীতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সায় রয়েছে ওড়িশা সরকারের।

মহিলা সংরক্ষণ বিল

মহিলা সংরক্ষণ বিলের প্রাসঙ্গিকতা

পারুল মণ্ডল

মহিলা সংরক্ষণ বিলের বিষয়টি ভারতে প্রথম উত্থাপন করা হয় ১৯৯৬ সালে। গীতা মুখার্জীর নেতৃত্বে গঠিত যুগ্ম-কমিটি প্রথম মহিলা সংরক্ষণ বিলের কথা বলেন। ২০০৪ সালের সংবিধান সংশোধন বিলে (১০৮তম সংশোধন) প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, লোকসভা এবং প্রত্যেকটি বিধানসভার এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলা প্রতিনিধিদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলির বন্টনের পুরো ব্যাপারটিই তত্ত্বাবধান করবে পার্লামেন্ট। এই বিলে আরও বলা হয়, তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসনের এক-তৃতীয়াংশ আসনও ওই শ্রেণীর মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ করা হবে। মহিলা সংরক্ষণ বিলটি পাশ হওয়ার ১৫ বছর পর্যন্ত এই

শরদ যাদব উবাচ—মহিলা বিল পাশ হলেই বিষ খাব।

আইনের কোনও পরিবর্তন করা যাবে না এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হবে।

যারা মনে করেন সংসদীয় নির্বাচনে এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হলে সংরক্ষিত আসনগুলিতে জনগণের পছন্দটা অনেকটাই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে, তারা মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যাপারটিতে আরও দুটি বিকল্প পথের সন্ধান দিয়েছেন। প্রথমত, ফ্রান্স ও সুইডেনের অনুকরণে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ। দ্বিতীয়ত, Dual Member Constituencies। এই সব নির্বাচন কেন্দ্রে দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবেন। তার মধ্যে একজন অবশ্যই হবেন মহিলা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যদি রাজনৈতিক দলগুলিতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়, সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলির পক্ষেও বিভিন্ন স্থানের সামাজিক ও আঞ্চলিক পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রার্থী এবং কেন্দ্র নির্বাচন করতে অনেক সুবিধা হবে। ভোটাররাও তাদের প্রার্থী পছন্দের ক্ষেত্রে অনেকটা গণতান্ত্রিক হতে পারবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি বিশাল সমস্যা হলো, এই পদ্ধতিতে সংসদে মহিলাদের ৩৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারটি অনিশ্চিত হয়ে পড়বে এবং রাজনৈতিক দলগুলিও যে সমস্ত কেন্দ্রে তারা দুর্বল সেই সমস্ত কেন্দ্রে মহিলা প্রার্থীদের ব্যবহার করবেন। দ্বিতীয় বিকল্পের ক্ষেত্রেও সংসদে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব ৩৩ শতাংশ করতে গেলে দুই সদস্যের নির্বাচন কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করতে হবে, যা বাস্তবে অসম্ভব।

বিগত ১৩ বছর ধরে কেন্দ্রের সরকার এই মহিলা সংরক্ষণের বিলটি পার্লামেন্টে পাশ করানোর চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু লাগাতার কিছু রাজনৈতিক দল এই বিলের বিরোধিতা করে চলেছে। এমনকী বিলের বিরোধিতায় একজন বিখ্যাত সাংসদ একথাও বলেন যে, "মেয়েরা যদি সবাই পার্লামেন্টে চলে আসে, তাহলে বাড়িতে রান্না করবে কে?" যে সমস্ত রাজনৈতিক দল এই বিলের বিরোধিতা করছেন, তাদের মনে রাখা উচিত ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ মহিলা। কিন্তু ভারতের সংসদে মহিলা প্রতিনিধিত্ব মাত্র ১০ শতাংশ।

সংবিধান তৈরির সময় সংবিধান রচয়িতারা ভেবেছিলেন, সমাজের প্রতিটি স্তরে প্রতিনিধিত্ব নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্বাভাবিক ভাবে উঠে আসবে। কিন্তু পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনেও তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। গ্রামীণ ভারতবর্ষের ৩৫ শতাংশ পরিবার মহিলাদের উপার্জনের ওপর চলে। সেক্ষেত্রে মহিলারাও মূল্যবৃদ্ধি ও অন্যান্য অনিশ্চয়তার শিকার হন। মহিলাদের এই অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য, দেশ শাসনের ক্ষেত্রে তাদের সুনির্দিষ্ট প্রতিনিধিত্ব থাকা অত্যন্ত জরুরি। বাস্তবে দেখা গেছে যে, পঞ্চায়েত-রাজে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে যে সমস্ত মহিলা প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁরা পুরুষ প্রতিনিধিদের তুলনায় অনেক বেশী সক্ষম এবং সম্পদের বন্টনের ক্ষেত্রেও তাঁরা পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশী এগিয়ে। মহিলা সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে তাঁরা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী ব্যয় করেছেন।

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষের মহিলারা ঘর-গৃহস্থ সামলানো থেকে রাজনীতি, সমাজনীতি, সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য, অসিচালনা এমনকী যুদ্ধ বিদ্যাতেও নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যদিও সময়ে সময়ে আমাদের সমাজে নারীদের প্রতি বিভিন্ন কুসংস্কার এবং দমনমূলক নীতির উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু সেই সমস্ত কু-রীতি এবং কু-সংস্কারের অবসানও ঘটেছে সমাজের ও সময়ের গতির স্বাভাবিক নিয়মে। ভারতে নারীদের অধিকার লাভের জন্য কোনও তথাকথিত ক্ষৈন্দ্বপ্রন্দ্বন্দ্বক্ক ত্ত্বপ্পন্দ্বপ্পন্দ্বক্কক্ত করতে হয়নি, যেহেতু ভারতের নারীরা পাশ্চাত্যের নারীদের তুলনায় শিক্ষায়, জীবিকা নির্বাচনে অনেক বেশী পিছিয়ে। পাশ্চাত্যের নারীরা অনেক বেশী প্রগতিশীল। কিন্তু এই 'প্রগতি' শব্দটির অনেক সময় অপব্যবহার করা হয়। বিশেষত পাশ্চাত্যে, পাশ্চাত্যের এই 'প্রগতি' শব্দটির অপব্যাখ্যার ঢেউ ভারতেও সমাগত।

ভারতের তথাকথিত নারীবাদীরা যে প্রগতির কথা প্রচার করেছেন, তা 'যথেচ্ছাচার' ছাড়া কিছুই নয়। তথাকথিত প্রগতিশীল এই নারীবাদীদের মনে রাখা উচিত যে, নারীদের স্বভাবের স্নেহশীলতা ও সুকুমার্য প্রকৃতি প্রদত্ত, মায়েরা তাদের সন্তানদের যত্ন করেন তাদের স্নেহশীলতার জন্য। এক্ষেত্রে কোন 'দায়বদ্ধতা' বোধ কাজ করে না। পোষাকে উদ্ভট চাকচিক্য, অশালীন অঙ্গ ভঙ্গি প্রগতিশীলতার লক্ষণ হতে পারে না— এই সত্যও আজ প্রমাণিত। পাশ্চাত্যের এই রুচিহীন প্রগতিশীলতার ভিত্তি এতই দুর্বল যে আজ ইউরোপ, আমেরিকা প্রায় সব দেশেই তা ভাঙতে শুরু করেছে।

ইউরোপ বা আমেরিকায় হিলারি ক্লিন্টনের পরাজিত হওয়ার অন্যতম কারণ ছিল, তিনি একজন মহিলা। কিন্তু ভারতীয় সভ্যতায় রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ স্বাভাবিক। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসেও আমরা দেখি, রাণী লক্ষ্মীবাঈ নিজের রাজ্য শাসনের প্রয়োজনে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেও পিছপা হননি। নেতাজীর নেতৃত্বে তৈরি হয়েছিল মহিলা সেনাবাহিনী, যার উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

অবশ্য আমাদের একথাও মনে রাখা উচিত, মহিলা সংরক্ষণ বিলের মূল উদ্দেশ্য হলো মহিলাদের রাজনীতির ক্ষেত্রে সচেতন করা, এবং তাদের মধ্যে সুপ্ত নেতৃত্ব-ক্ষমতার পরিস্ফুটন ঘটানো। মহিলাদের সক্রিয়তার মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতিতে, সমাজের প্রত্যেক স্তরের প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে সমতা আনা। তাই ভারতীয়

সুষমা-বৃন্দা জুটি মহিলা বিলের দাবীতে সরব।

রাজনীতিতে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট অংশ সংরক্ষণের মাধ্যমে মহিলাদের শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারটা কতটা আন্তরিক বা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া তা অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখা উচিত। এটা যেন শুধু নিয়মরক্ষা না হয়ে দাঁড়ায়। যখন আমাদের দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল নিজেদের দলীয় ব্যবস্থায় স্থানীয় স্তর থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় স্তর পর্যন্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মহিলাদের যোগদানকে এগিয়ে নিয়ে আসার জন্য উৎসাহ দেবে, তখনই এই মহিলা সংরক্ষণ বিলের মূল উদ্দেশ্য স্বার্থকতা লাভ করবে।

যে সমস্ত রাজনৈতিক দল এই মহিলা সংরক্ষণ বিলের বিরোধিতা করেছেন, তাঁদের মনে রাখা উচিত যে এই বিরোধিতার মাধ্যমে তাঁরা ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার মূল নীতিকেই অগ্রাহ্য করছেন। ভারতীয় মহিলাদের অংশগ্রহণকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মহিলা সংরক্ষণ বিল হয়ে উঠুক আদর্শ মাধ্যম। এই অঙ্গীকার যদি আমরা করতে পারি, তবেই মহিলা সংরক্ষণ বিল হয়ে উঠবে যথার্থ।

মোল্লাতন্ত্রের নাগপাশ ও মুসলমান মেয়েরা

বিশেষ সংবাদদাতা।। মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং আসন সংরক্ষণ নিয়ে লোকসভা, রাজ্যসভা, বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভায় গলাবাজিতে কোনও দলই পিছিয়ে নেই। কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে 'বিধির বাঁধন' ভাঙতে কোনও দলই অগ্রসর হয়নি। ইন্টারনেটের যুগেও মুসলিম সমাজে বাল্যবিবাহ রোধ করা যায়নি। মুসলিম প্রধান গাঁ-গঞ্জে গেলেই চোখে পড়বে অপরিণত বুদ্ধির সরলমতি নাবালিকা বধূদের। এইসব নাবালিকা ও কিশোরীদের শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক গঠন— কোনওটাই পরিণত নয়। এইসব মেয়েদের অপরিপক্বতার সুযোগ নিয়ে তাদের ঠকানো হয়।

হিন্দু সমাজে রামমোহন বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব হলেও মুসলিম সমাজে মেয়েদের অধিকার রক্ষার জন্য এরকম কোনও মহাপুরুষের জন্ম হয়নি। পণপ্রথা মুসলিম সমাজে এখনও বর্তমান। একবেলাও ঠিকমতো ভাত জোটে না, কিন্তু পণ দেনমোহর ছাড়া বিয়ের কথা মুসলিম বাবা-মায়েরা ভাবতেই পারেন না। পাকিস্তানের মতো মুসলমান প্রধান দেশে ১৯৭০ সালে পণপ্রথা বেআইনী ঘোষণা করেও ১৯৭৬ সালে নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ লেনদেন করা যাবে বলে নতুন আইন পাশ হয়। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০০১ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে পণপ্রথায় মৃত্যু হয়েছে ৩৪,২৯৪ জনের। এর মধ্যে মুসলিম মহিলার সংখ্যাও কম নয়। তবে বেশিরভাগ সময়ই পণপ্রথার কারণে মুসলিম মেয়েদের মৃত্যুর সংবাদ চাপা থাকে। মুসলিম ম্যারেজ অ্যাক্টে যেখানে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে বাধ্যতামূলক হয়ে

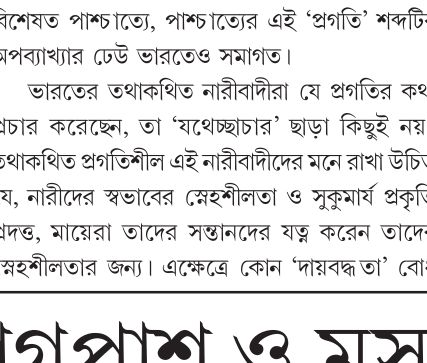

গেছে, সেখানে কাজীরা পরামর্শ দেন রেজিস্ট্রি না করার। কোনও সই সাবুদ, সাক্ষী, প্রমাণ ছাড়াই বিয়ে হয়ে যায়, আবার কথায় কথায় তিন তালাক দিয়ে বিচ্ছেদও হয়ে যায়।

সরকারি হিসেবেই মাত্র ১৫ শতাংশ মুসলিম মেয়ে সরকারি স্কুলে যায়। বাকি ২৫ শতাংশ যায় মাদ্রাসায়। বাবা-মায়ের যুক্তি, মেয়েদের পড়াশুনা করে কি হবে? মুসলিম সমাজে ৭০ শতাংশ নারী নিরক্ষর। নিরক্ষর হোন বা সাক্ষর, প্রতিটি মুসলিম পুরুষ কিন্তু মনে করেন স্ত্রী যেহেতু তার থেকে বয়সে ছোট, তাই তাকে শাসন করার সবটুকু অধিকার তার স্বামীর আছে। মুসলিম সমাজে মেয়েদের কোনও স্বাধীনতা ও অধিকার নেই। স্বামী একাধিক নিকাহ্ করলেও স্ত্রীর কোনও অধিকার নেই তা নিয়ে কোনও প্রতিকার করার। মুসলিম পুরুষ মনে করে, মহিলারা হচ্ছে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রমাত্র। নিম্ন মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজে আঠারো বছরের আগেই বিয়ে হয়। সন্তান একাধিক। তারা স্কুলে যায় না। যদিও যায়, লেখাপড়া করতে নয়, খিচুড়ি খেতে। মহিলারা চাষের জমিতে বা অন্য কোথাও কাজ করে। সরকারি পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে মুসলিম শিশুকন্যা বা কিশোরীদেরই সবথেকে বেশি পাচার করা হয়।

মুসলিম সমাজ এখনও উচ্চশিক্ষিত মহিলাকে পছন্দ করে না। বেশির ভাগ বাবা-মা মেয়েকে উচ্চশিক্ষিত করতে চায় না। কারণ মুসলিম সমাজে উচ্চশিক্ষিত পাত্রের

(এরপর ১০ পাতায়)

মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রশ্ন এবং মহিলা সংরক্ষণ বিল

নবকুমার ভট্টাচার্য

একবিংশ শতাব্দীতেও নারীভ্রূণ হত্যা চলছে। পণপ্রথা শুধু জাঁকিয়ে বসে নেই, আজও পণপ্রথার বলি হতে হয় হাজারও মেয়েকে। তবু এর পাশাপাশি নারী কিন্তু দ্রুত আত্মপ্রকাশে আগ্রহী হচ্ছে। এককালে পুরুষেরই প্রত্যক্ষ সাহায্য ও প্রেরণায় নারীর স্বনির্ভরতার তাগিদ তৈরি হয়েছিল। সতীদাহ প্রথা বন্ধের আন্দোলন, বিধবা বিবাহ আন্দোলন, বাল্যবিবাহ রোধের উদ্যোগ এবং সর্বোপরি নারীশিক্ষা— বাংলার সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢেউ তুলেছিল। অথচ গত উনিশ শতকের শুরুতেও বাংলায় স্ত্রী-শিক্ষার অবস্থা ছিল শোচনীয়। সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্তঃপুরে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকলেও, সাধারণ গৃহস্থ পরিবারে মেয়েদের

স্বর্ণকুমারী দেবী

শিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই ছিল না। বরং পড়াশোনা করলে মেয়েরা 'বিধবা' হয়, এমনটাই ছিল ধারণা। ১৮৯১ সালে রাজা রামমোহনকে সহমরণ বিষয়ে এক বাদানুবাদে বলতে হয়েছিল, "স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধির পরীক্ষা কোনওকালে লইয়াছেন যে তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন? কারণ, বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে, ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হইতে পারে। আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায়ই দেন না। তবে তাহারা বুদ্ধি হীন, ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?" যদিও ওই বছরেই কলকাতায় প্রথম প্রকাশ্য বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা হয়। স্কুল সোসাইটির বালকদের সঙ্গে বালিকাদের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন রাজা রাধাকান্ত দেব। ১৮৫৪ সালে মাদ্রাজে ২৫০টি বালিকা বিদ্যালয়ে ৮০০০ ছাত্রী, মুম্বাইতে ৬৫টি বিদ্যালয়ে ৬৫০০ ছাত্রী এবং বাংলায় ২৮৮টি বিদ্যালয়ে ৬৮৬৯ জন ছাত্রী পড়ত। ১৮৭৬ সালে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের চেষ্টায় স্থাপিত হয় 'বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়'। সেই সময়ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীদের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের সাক্ষর কিন্তু যথেষ্টই পাওয়া যায়। রাজনীতিতেও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ সে যুগে একেবারে ছিল না, তাও কিন্তু নয়। মেয়েদের রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্জনে ও দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় যথেষ্ট উদ্যোগী ছিলেন। জাতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মেয়েদের ডেলিগেট হওয়ার দাবী নিয়ে আন্দোলন করেন ও পঞ্চম অধিবেশন হওয়ার আগেই কংগ্রেস সেই দাবী মেনে নেওয়ায় ১৮৮৯ সালে মুম্বাই শহরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাতে ছয়জন মহিলা ডেলিগেট হিসেবে যান— যাঁদের মধ্যে অন্যতম দ্বারকানাথের স্ত্রী কাদম্বিনী দেবী। এছাড়াও ছিলেন স্বর্ণকুমারী দেবী। ১৮৯০ সালে কংগ্রেসে এটাও স্বীকৃত হলো যে, মেয়েরা প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারে এবং আলোচনা করতে পারে।

অ্যানি বেসান্ত তাঁর "How India Wrought for her freedom" বইতে লিখেছেন, "The first woman who spoke from the congress platform, a symbol that India's freedom would uplift womanhood" । কাদম্বিনী দেবী পরে আরও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েন রাজনীতিতে। ১৯০৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হলে এর সাহায্যের জন্য যে সভা তৈরি হয়, তার নেত্রী ছিলেন কাদম্বিনী দেবী—

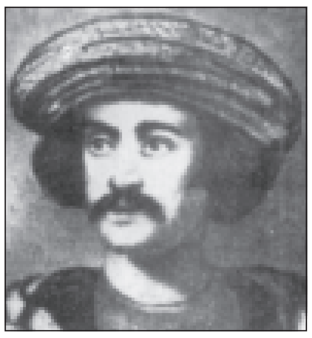
রামমোহন রায়

প্রথম ভারতীয় মহিলা চিকিৎসক। বিহারের কয়লাখনির মহিলা শ্রমিকদের খোঁজ করার জন্য কাদম্বিনী দেবী ও কামিনী রায় ১৯২২ সালে নানা কোলিয়ারি অঞ্চলে ঘুরেছিলেন। মেয়েদের সচেতনতা ও স্বনির্ভরতার প্রতি উৎসাহিত করার জন্য স্বর্ণকুমারী দেবী প্রতিষ্ঠিত 'সখী সমিতি' খুবই উদ্যোগী হয়েছিল। এমনকি স্বর্ণকুমারীর একটি গান স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার ছেলেমেয়েদের উজ্জীবিত করেছিল। স্বর্ণকুমারীর ছোট মেয়ে সরলা দেবী 'ভারতী' পত্রিকার মাধ্যমে দেশপ্রেমের কথা শোনান বাঙালিকে। তাঁর লেখা 'হিন্দুস্থান' গানটি গাওয়া হয় ১৯০১ সালে কলকাতা কংগ্রেসে। ১৯০৩ সালে তিনি করেন প্রতাপাদিত্য উৎসব। ১৯০৪ সালে বীরাষ্টমী ব্রত উদ্‌যাপন করে বাঙালিকে শক্তিমুখী করে তুলতে চান। বস্তুত বাংলার নারী সমাজ প্রথম থেকেই পুরুষের সঙ্গে রাজনীতিতে যোগ না দিলেও নানাভাবে সাহায্য করত। ক্ষমতায়নের প্রশ্নে সিপাহি যুদ্ধের সময় ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। রানী ভবানী, রানী রাসমণি, স্বর্ণময়ী, জাহ্নবী, শরৎকুমারী প্রমুখ বহু মহিলা রাজকার্য পরিচালনায় ছিলেন যথেষ্ট কৃতী। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরে কেউ কেউ প্রকাশ্য রাজনীতিতে অংশ নিলেও, যাঁরা প্রকাশ্য রাজনীতিতে অংশ নেননি, তাঁরাও পরোক্ষভাবে স্বামী পুত্রকে সাহায্য করেছেন এই কাজে। এমনকি যোগেশ চন্দ্র বাগলের মতে, "কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব হইতেই রাজনৈতিক আন্দোলন বাংলাদেশে যে বিশেষ দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারিয়াছিল, তাহার মূলে রহিয়াছে নারীর কল্যাণ হস্ত ও নীরব আত্মদান।" স্বাধীনতার পর বহু কৃতী মহিলা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য হিসেবে মহিলারা নির্বাচিত হয়েছেন, মন্ত্রী হয়ে কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন অনেকেই। ভারতবর্ষ উপহার দিয়েছে দেশের মহিলা প্রধানমন্ত্রী।

১৯৯৫ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের চতুর্থ বিশ্ব মহিলা সমাবেশে 'রেজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন'-এ যে বিষয়টির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে তা হলো, মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। গণতন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে ক্ষমতার জায়গায় মহিলাদের অনুপস্থিতির ব্যাপারটি খুবই স্পষ্ট। মহিলারা 'ডিসিশন মেকিং'-এর স্তরে না থাকার জন্য একদিকে লজ্ঘিত হচ্ছে বৃহত্তর রাজনৈতিক ন্যায় ও সমানাধিকারের বিষয়টি, অন্যদিকে মহিলাদের অনুপস্থিতিতে বিশেষ খামতি থেকে যাচ্ছে মহিলা সংক্রান্ত পলিসি বা চিন্তা ভাবনার প্রসঙ্গ

কাদম্বিনী দেবী

গুলিতে। আজ মহিলা সংরক্ষণ বিল সংসদে পেশ করার এক মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি একজন মহিলা, সংসদের অধ্যক্ষ একজন মহিলা, ইউ পি এ সরকারের রাষ্ট্রচালনার রাশ যার হাতে, তিনিও একজন মহিলা। অথচ সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল উত্থাপন নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য নেই। নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে রয়েছে সংসদে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের বিষয়টি। ১৯৯৮ ও ২০০৮ সালে জাতীয় দলগুলির প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিলটি সংসদে পাশ করানো যায়নি প্রধানত জনতা দল (ইউ), সমাজবাদী পার্টি ও বহুজন সমাজ পার্টির নেতাদের উচ্চকিত ও নাটকীয় বিরোধিতায়। লালুপ্রসাদ যাদবও দেহাতি বাগ্মীতায় এর বিরুদ্ধে মতামত জ্ঞাপন করেছেন। শারদ যাদব, যিনি বিষপান করে আত্মঘাতী হবার হুমকি দিয়েছেন, আর মুলায়ম সিং যাদব, যিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এই বিলের ফলে তাঁর মতো বহু পুরুষের রাজনৈতিক কেরিয়ার খতম হয়ে যাবে ভেবে। এই হট্টগোলের মধ্যে কেউ কেউ প্রস্তাব দিয়েছেন, ১৯৫১ সালের রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস্ অ্যাক্টকে সংশোধন করলে এক-তৃতীয়াংশ মহিলাদের জন্য নির্ধারিত করা বাধ্যতামূলক হয়ে যাবে। কিন্তু ভোটে টিকিট দেওয়া আর আসন সংরক্ষণ এক নয়। কারণ, নির্বাচনে লড়াইয়ের সুযোগ পাওয়া মানেই কিন্তু জিতে যাওয়া নয়। রাজনৈতিক দলগুলি চেষ্টা করবে অপেক্ষাকৃত কমজোরি নির্বাচনী কেন্দ্রে মহিলা প্রার্থীদের ঠেলে দিতে। যার ফলে জয় নয়, সুনিশ্চিত হবে হারের বিষয়টি।

লালুপ্রসাদ ও মুলায়মদের বক্তব্য, তেত্রিশ শতাংশের পরিবর্তে তারা দশ বা পনের শতাংশ সংরক্ষণ করতে দিতে রাজি। আসলে এখনকার আসন সংখ্যার হিসেবে ১৮১টি

(এরপর ১০পাতায়)

মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে বিশিষ্ট নারীদের মতামত

সংশয় আর দোলাচল-ই সম্বল

অর্ণব নাগ

রাজনীতিতে মহিলাদের ক্ষমতায়নের প্রশ্নে কী সাংসদ, কী বুদ্ধিজীবী (এঁরা সকলেই মহিলা), কী মহিলা কমিশনের সদস্যা, সকলেই এককাট্টা। সংসদে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যাপারেও তাঁরা সকলেই প্রায় একমত (এক্ষেত্রে অবশ্য কিছুটা হলেও ব্যতিক্রমী রুশোতি সেন এবং এষা দে, পুরোপুরি ব্যতিক্রম মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়)। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টাটা বাঁধার ব্যাপারে অর্থাৎ 'মহিলা সংরক্ষণ বিল' নামক বস্তুটি কেবল সংসদেরই বিষয়, নাকি তা সামাজিক স্তরেও প্রতিভাত হওয়া দরকার— তা নিয়েই অদ্ভুত একটা ডিলেমা তৈরি হচ্ছে সাংসদ ও মহিলা কমিশনের সদস্যাদের মধ্যে। কিছুদিন আগেও মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন পদে থাকা যশোধরা বাগচীকে এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সটান জবাব— "আপনি বরং সাংসদদের কারুকে ফোন করুন।" ফোনে কথা বলার পূর্বাপর অভিজ্ঞতা যশোধরাদেবীর খুব একটা সুখের নয় বলেই আর মুখ খুললেন না। তবে তাঁর মনোভাবটা বোধহয় কিছুটা পরিস্ফুট হয় মহিলা কমিশনের আরেক প্রাক্তন চেয়ারপার্সন বেলা দত্তগুপ্তের কথায়। তাঁর বক্তব্য— "মহিলা কমিশনের হাতে কাজ করার কোনও ক্ষমতাই দেওয়া হয় না।" তার প্রমাণ, সমকালীন এক পুলিশী অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতা অনুযায়ী, এক নির্যাতিতা মহিলাকে নিয়ে বেলা দেবীরা কলকাতা পুলিশের অন্তর্গত বড়তলা থানায় গেলে এক কর্তব্যরত পুলিশ অফিসার তাঁদের রোদের মধ্যে থানার অদূরে একটি বেঞ্চে বসিয়ে রাখেন বেশ খানিকক্ষণ। সর্বোপরি বেলাদেবীর উপস্থিতিকে বিশেষ পাত্তা দেবার প্রয়োজন মনে করেন না সেই পুলিশ অফিসারটি। বাম জমানায় মহিলাদের ওপর অত্যাচার কোনও অকস্মাৎ ঘটনা না হলেও, খোদ মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন এহেন দুর্বিসহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন— এমন ঘটনা সংবাদমাধ্যমে গত তেত্রিশ বছরে কতটা গুরুত্ব পেয়েছে তা বলা বেশ মুশকিল।

সংসদে মহিলাদের ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ব্যাপারে গলা ফাটানোর মতো সি পি এমে এই মুহূর্তে একমাত্র বৃন্দা কারাত বাদ দিলে আর তেমন কেউ নেই। বৃন্দা এই বিষয়টা নিয়ে সংসদে ইতিপূর্বে বহুবার গলাবাজি করেছেন, কিন্তু তাঁর পার্টি সি পি এমেই সেই চিল-চিৎকার করা গলা আপাতত নিস্তেজ হয়ে পড়েছে (কারণ সি পি এমের সর্বোচ্চ কমিটি পলিটব্যুরোতে তিনিই একমেবাদ্বিতীয়ম্ মহিলা সদস্যা ও পশ্চিমবঙ্গের ছয় দাপুটে বিরোধী মহিলা সাংসদদের পাশাপাশি তাঁর পার্টির সুস্মিতা বাউড়ি সাংসদ পদবাচ্য হিসেবে সেভাবে গণ্যই হচ্ছেন না)। কিন্তু এব্যাপারে আশা ও ভরসার কেন্দ্রস্থলে থাকা তৃণমূলের চার সাংসদ (মমতা ব্যানার্জী, কাকলি ঘোষ-

দস্তিদার, রত্না দে-নাগ, শতাব্দী রায়) আপাতত তেমন কিছু ভাবছেন বলে মনে হচ্ছে না।

দিল্লীতে ফোনে ধরা হলে কাকলি ঘোষ- দস্তিদার সরাসরিই বললেন, "মহিলা সংরক্ষণ বিল সংসদে উত্থাপনের ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কোনও পার্টিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। কারণ, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে রাজ্যজুড়ে সন্ত্রাস— এই বিষয়টাই ফোকাস করতে চাইছেন সংসদে।" কাকলি দেবীরা আপাতত তাকিয়ে রয়েছেন রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিল অধিবেশনের শুরুতে মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে যে আশ্বাস দিয়েছেন তার দিকে। তৃণমূলের আরেক মহিলা সাংসদ শতাব্দী রায় দিল্লী থেকে ফেরার পথে জানালেন,— এবারে তিনি বিষয়টি তোলেননি (নাকি তোলার সুযোগ পাননি?)। তবে ডিসেম্বরের

(এরপর ১০পাতায়)

চিঠিপত্র

হজযাত্রায় সরকারি অনুদান

বছর পনের আগে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও ১৯৯২ সালে অযোধ্যার বিতর্কিত কাঠামো ধবংসের কারণে মুসলমানদের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে মুসলমানদের জন্য হজ ভর্তুকি চালু করেছিলেন। অর্থাৎ ভারতের মুসলমান, যারা মক্কায় হজ করে হাজি হতে যাবেন, সরকার থেকে তাদের আর্থিক অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। যদিও হিন্দু তীর্থযাত্রীদের মানস সরোবর, কৈলাশ, কুম্ভ, সবরীমালাই, গঙ্গাসাগর প্রভৃতি তীর্থযাত্রায় অনুদানের ব্যবস্থা তো নেই-ই, উপরন্তু বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে তীর্থকর নেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

মুসলিম সমাজের উলেমাগণ সম্প্রতি উপলব্ধি করলেন, ইসলাম শাস্ত্রানুযায়ী অন্যের আর্থিক অনুদানে হজ করাটা অনৈতিক বা ধর্মবিরুদ্ধ। হজযাত্রীদের কাছেও এটা বিভ্রম সৃষ্টি করছে। তাই মুসলিম সাংসদদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে আর্জি, হজযাত্রায় ভর্তুকি তুলে নিয়ে অন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থা করা, যাতে হজযাত্রীরা নিজেদের অর্থেই হজ সম্পন্ন করতে পারে। ভাবী হজযাত্রীরা তাদের সামর্থ অনুযায়ী হজ ব্যবস্থাপক কমিটির তহবিল 'হজকিট্টি'তে অর্থ গচ্ছিত রাখবে। তারা তাদের দেয় অর্থ মাসিক বার্ষিক বা এককালীন ভিত্তিতে জমা করতে পারবে এবং হজযাত্রার সময় প্রয়োজনমতো অর্থ তুলে নিতে পারবে। উদ্বৃত্ত অর্থ ইসলামের নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হতে পারবে অথবা লগ্নিকারীদের মধ্যেও ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে। ইসলামের নিয়মানুযায়ী, সুদ নেওয়া, জুয়া খেলা, ফাট্‌কা, মদ, পর্ণোগ্রাফি, লটারি বা শুয়োরের ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কোনও কোম্পানিতে অর্থ বিনিয়োগ করা চলে না। এ বিষয়ে সাংসদদের একটা প্রস্তাব কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিবেচনাধীন রয়েছে। কারণ, হজযাত্রায় অনুদান সঙঘ পরিবারের মুসলিম তোষণের অভিযোগকেও জোরদার করছে। তাছাড়া মুসলিমদের অধিক আর্থিক সুবিধা দেওয়ার বিষয়ে এক শিবসেনা কর্মীর এলাহাবাদ হাইকোর্টে রুজু করা মামলার বিষয়টিও চিন্তার কারণ হয়েছে। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহও তাঁর মেয়াদকালের মধ্যেই বিষয়টির একটি পরিবর্তন চান। তবে কেন্দ্রীয় বা রাজ্যস্তরের হজ অনুদান ব্যবস্থাপকদের এবিষয়ে বিরোধিতাও রয়েছে। কেননা, সেক্ষেত্রে তাঁরা নিজেরা হয়তো গুরুত্বহীন বা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বেন, যদি বিকল্প কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই ব্যবস্থাপকরা যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তিশালী। সেক্ষেত্রে এদের অগ্রাহ্য করাও খুব কঠিন।

কেন্দ্রীয় হজ কমিটির সহসভাপতি বলেন, "আমরা ভারতীয়। অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমরা ভারত সরকারকে কর দিই (হিন্দুরা কি কর দেয় না?)। জাতীয় রাজস্ব সংগ্রহে আমাদেরও অবদান রয়েছে। অতএব আমাদের অধিকার রয়েছে সরকারি অনুদানের। কিন্তু রাজ্যসভার ভাইস চেয়ারম্যান কে রহমান খানের নেতৃত্বে মুসলিম সাংসদরা ধর্মীয় বিধানের ধুয়ো তুলে সরকারি ভর্তুকির বিরোধিতায় বিকল্প ব্যবস্থা সমর্থন করছেন। গত ১৫ বছর ধরে হজযাত্রায় সরকারি ভর্তুকি নেওয়ার পর সমাজবাদী পার্টির সাংসদ শাহিদ সিদ্দিকি বলেছেন, "ইসলাম হজযাত্রীদের জন্য সরকারি ভর্তুকি সমর্থন করে না।" তিনি আরও বলেন, কোনও রাষ্ট্র এমনকি কোনও ইসলামিক রাষ্ট্রও হজযাত্রায় আর্থিক সাহায্য অনুমোদন করে না।

সাংসদ মহোদয় এবং উলেমাদের এই জ্ঞানোন্মেষটা কয়েক বছর আগে হলে সরকারের ৩-৪ হাজার কোটি টাকার সাশ্রয় হত। আর এক সাংসদ অভিযোগ করেছেন এই ভর্তুকি হজযাত্রীদের রাষ্ট্রীয় বিমান সংস্থার পরিষেবা গ্রহণে বাধ্য করে। অর্থাৎ হজযাত্রীদের নিজেদের পছন্দমতো বেসরকারি বিমান সংস্থার পরিষেবা গ্রহণে অপারগ করে তোলে। ওই সমস্ত বেসরকারি বিমান সংস্থা নাকি একই বিমান ভাড়ায় সৌদি আরবে হোটেল পরিষেবা, ভ্রমণ প্রভৃতির ব্যয় বহন করে। সাংসদরা মনে করেন, মালয়েশিয়রা অধিক স্বচ্ছল হলেও পূর্বোল্লিখিত লগ্নিকরণ পরিকল্পনা ভারতের মুসলমানদের ক্ষেত্রে ভাল ফল দেবে। কারণ মালয়েশিয়রা যেখানে মাত্র ১.৫ কোটি, ভারতীয় মুসলমানরা সেখানে ১৫ কোটি। এদের দশ শতাংশও যদি 'হজ কিট্টি'-তে লগ্নি করে তাহলে বছরে ৮ থেকে ১০ হাজার কোটি টাকা জমা হয়। ২০০৭ সালে হজযাত্রীদের জন্য ৩০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দেওয়া হয়েছিল। সাংসদরা অথগৃধ্নু তক্‌মাকে ঝেড়ে ফেলার জন্য প্রস্তাব রাখেন লগ্নিকারীদের আর্থিক দায় মিটিয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ স্কুল, হাসপাতাল, অনাথালয় প্রভৃতি গড়ে তোলা হবে। কে রহমান খান বলেন, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের দরিদ্র মুসলমানরা এই পরিকল্পনায় সর্বাধিক উপকৃত হবে। গত বছর প্রায় ১.৫ লক্ষ মুসলমান হজ করেছেন। এদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের পরই পশ্চিমবঙ্গের হজযাত্রীদের সংখ্যা সর্বাধিক।

মনে রাখা দরকার, ভারত থেকে মক্কায় হজ করতে যাওয়া অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কতজন দরিদ্র মুসলমানের পক্ষে ওই ব্যয়বহুল হজযাত্রায় অংশগ্রহণ সম্ভব? খুব কম সংখ্যকই। যারা হজ করে হাজী হন, তাঁরা প্রত্যেকেই ধনী। উচ্চবিত্ত এবং সম্পন্ন পরিবারের। তাদের জন্য সরকারি অনুদান অত্যন্ত বিসদৃশ, দৃষ্টিকটু। কিন্তু উপায় নেই। মুসলিম ভোটের লালসায় কেন্দ্রীয় সরকার ওই পরিমাণ অর্থ প্রতি বছর ব্যয় করে চলেছে। শুধুমাত্র হজযাত্রায় ভর্তুকি নয়, মসজিদের ইমামদের মাহিনা বৃদ্ধি, মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যয়, চাকরিতে সংরক্ষণ, ধনী বা উচ্চবিত্তদেরও উচ্চশিক্ষায় সরকারের পক্ষ থেকে ব্যয় বহন, সন্ত্রাসীদের মদতদাতা হিসেবে মুসলমানদের হেনস্থা না করার নির্দেশ। মুসলমানদের নামে রাস্তার নামকরণ ছাড়াও আরও নানান কিসিমের ব্যবস্থা। তবুও মুসলমানদের মন জয় করা যাচ্ছে না। কারণ, ভারতকে ইসলাম রাষ্ট্র বানানোই তাদের লক্ষ্য। কাজেই লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবেই।

—শুভব্রত ব্যানার্জী, বড়বাজার, চন্দননগর।

সংশয় আর দোলাচল-ই সম্বল

(৯ পাতার পর)

মাঝামাঝি সংসদের অধিবেশনে এসে মহিলা সংরক্ষণ বিলের ব্যাপারটি তুলে ধরার চেষ্টা করবেন। যদিও দুই সাংসদই একমত হচ্ছেন যে, সংসদে মহিলাদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ প্রয়োজন।

তবে এটা নিয়েও নানা মুনির নানা মত রয়েছে। সাহিত্যিক সুকুমারী ভট্টাচার্যের জিজ্ঞাসা, "তেত্রিশ শতাংশ কেন? পঞ্চাশ শতাংশই বা নয় কেন?" এই জিজ্ঞাসাটাকেই পুরোপুরি বক্তব্যে পরিণত করে বেলা দত্তগুপ্ত বলছেন— "পঞ্চাশ শতাংশ মহিলা থাকা উচিত সংসদে। তাতে নারী-পুরুষের ভারসাম্যটা বজায় থাকবে।" অন্যদিকে প্রাবন্ধিক ডঃ মীরাতুন নাহার মনে করেন, "ন্যূনতম ৩৩ শতাংশ আসন সংসদে মহিলাদের জন্য অবশ্যই সংরক্ষিত থাকা উচিত।" একই ভাবনার শরিক অর্থনীতির অধ্যাপিকা রুশোতি সেন। কিছুটা মধ্যপন্থা নিয়ে তিনি বলেছেন,— ৩৩ থেকে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ প্রয়োজন। তবে একই সঙ্গে তিনি এটাও বলেছেন যে, এই সংরক্ষণ ব্যাপারটার মধ্যে কোথাও যেন একটা অসম্মানের কাহিনী লুকিয়ে রয়েছে। তাঁর মতে, মহিলা সংরক্ষণ বিল সমানাধিকারের দাবী করলেও মহিলাদের স্বাধীন শর্তের ব্যাপারে অনেকটাই উদাসীন। একই কথা বলছেন সাহিত্যিক এষা দে। লিঙ্গ-জাত-ধর্ম কোনও কিছুর ভিত্তিতেই সংরক্ষণের পক্ষপাতী নন তিনি। তবে এক্ষেত্রে একেবারেই অন্যরকম মনে করছেন মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, এই সংরক্ষণ বিল কার্যকরী হলে মেয়েদের লড়তে হবে মেয়েদেরই বিরুদ্ধে। তাতে আল্টি মেটলি 'লুজার' হবেন একজন নারীই। তাঁর কথায়, বরং রাজীব গান্ধীর আমল থেকে যেটার ব্যাপারে কথা হচ্ছে, অর্থাৎ মহিলাদের ভোটে ৩৩ শতাংশ 'জেনারেল নমিনেশন'— সেই জিনিসটাই বরং কার্যকর করা হোক।

তবে সংরক্ষণের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব যাই থাক না কেন, সাংসদ থেকে মহিলা কমিশনের সদস্যা— সবাই একমত যে, সংরক্ষণ বিল সংসদেপাশের মাধ্যমে সম্ভবপর হলেও এতে মহিলাদের প্রকৃত ক্ষমতায়নের বিষয়টা হয়তো অধরাই থেকে যাবে। এমনকী, সামাজিক ক্ষেত্রেও সংসদে এই বিল পাশ হলেই যে সাধারণ মহিলাদের অবস্থার বিশেষ হেরফের হবে তেমনটা মনে করছেন না কেউই। তবে তাঁদের সকলেরই অভিমত, মহিলা সংরক্ষণ বিলটা পাশ হলে একটা প্রাথমিক পদক্ষেপ অন্তত গৃহীত হবে। তবে মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ অন্যান্য চাহিদা এই বিল যে পূরণ করতে পারবে না সে ব্যাপারে নিঃসন্দিহান ডঃ মীরাতুন নাহার, সুকুমারী ভট্টাচার্য, রুশোতি সেন, মায় সাংসদ কাকলি ঘোষ-দস্তিদারও।

মহিলা সংরক্ষণ বিলে তাঁদের ক্ষমতায়নের বিষয়টি সত্যিই উপেক্ষিত কিনা— এই প্রশ্নের সদুত্তর মেলা যতই কষ্টসাধ্য হোক না কেন, শরিয়তি আইনে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা অসহায় মহিলারা ওই বিলের থেকে কত আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছেন তা ঈশ্বরও জানেন বলে মনে হয় না। রাখঢাক না করেই মহিলা কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন বেলা দত্তগুপ্ত এর জন্য মুসলিম সমাজের 'ছুন্নত' নামক অশ্লীল ধর্মীয় প্রথাকেই দায়ী করেছেন। মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, বন্য মরুভূমিতে মধ্যযুগে যে আইনের জন্ম, সময়ের সঙ্গে তা বদলানো উচিত। ডঃ মীরাতুন নাহারের মতে, এই শরিয়তী আইন কোরানে নেই। হাদিসকে ভিত্তি করে পুরুষতন্ত্রের ধবজাধারী কিছু মানুষই আপন স্বার্থের তাগিদে এই আইনের প্রণেতা। তাঁর উক্তি, "শরিয়তি আইন যারা মানছেন, দেশের সিভিল আইনও তাদের মানা উচিত।" রুশোতি সেনকে শরিয়তি আইন নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "এটা খুব জটিল জায়গা। ঠিক কি ভুল এত সহজে বলা যাবে না। এবিষয়ে গৌরী আয়ুব যা বলেছিলেন, অর্থাৎ অধিকারের নামে একটা অন্য সমস্যা দেখা দেবে, আমি তাকেই সমর্থন করি।" সুকুমারী ভট্টাচার্যও শরিয়তি আইনের জন্য দুষছেন পুরুষতান্ত্রিক প্রথাকেই। তবে এব্যাপারে বিন্দুমাত্র হেলদোল দেখাচ্ছেন না সাংসদ কাকলি ঘোষ-দস্তিদার। কারণ আরামবাগ-খানাকুলের সন্ত্রাস বন্ধ না হলে এনিয়ে ভাবতেই চান না তাঁরা (অর্থাৎ তৃণমূলের মহিলা সাংসদরা)।

মহিলাদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে মহিলা কমিশনের ভূমিকা একেবারেই খুশি করতে পারেনি এক প্রবীণা লেখিকাকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সেই লেখিকার বক্তব্য, "তবে এনিয়ে আমি কিছু বলব না। কারণ, মহিলা কমিশনের প্রাক্তন ও বর্তমান মিলিয়ে বেশ কয়জন চেয়ারপার্সন আমার অত্যন্ত স্নেহের প্রার্থী। মহিলা কমিশনের ভূমিকা অন্যরকমও হতে পারত।" আর 'বৃক্ষ তোমার নাম কি? ফলেন পরিচয়তে'— গোছের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মীরাতুন নাহারের মন্তব্য, "আমি ২০০১-০৪ পর্যন্ত মহিলা কমিশনের সদস্যা ছিলাম। তারপর পদত্যাগ করি। তাদের কাজে সন্তুষ্ট হলে নিশ্চয়ই পদত্যাগ করতাম না।"

এই তরজা বিরামহীন। কিন্তু যে দেশের প্রথম নাগরিক একজন মহিলা (পড়ুন প্রতিভা পাতিল) এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থানের অধ্যক্ষপদও এক মহিলার (পড়ুন মীরা কুমার) দ্বারা অলংকৃত, সেখানে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হওয়া নিয়ে এত সংশয় আর দোলাচল কেন? উত্তর নেই কারুর কাছে। সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই সংসদ!

মোল্লাতন্ত্রের নাগপাশ

(৮ পাতার পর)

এখনও অভাব। এছাড়া মোল্লাতন্ত্রের প্রভাব তো রয়েইছে। মুসলিম মহিলারা পড়াশোনা শিখে উচ্চশিক্ষিত হলে রক্ষণশীলতা ভেঙে যাবে— এই ভয়েই মেয়েদের বেশি লেখাপড়া শেখানো হয় না। তাছাড়া অন্ধ কুসংস্কার থেকে এই সমাজ এখনও মুক্ত হতে পারেনি। যৌন রোগাক্রান্ত কোনও মহিলাকে ডাক্তারের কাছে না নিয়ে গিয়ে এখনও পাপী বলে ঘরে ফেলে রাখা হয়। পুরুষরা স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব মেনে নিতে নারাজ। তাই গৃহকর্ম নিপুণা, নামাজী পাত্রীকে প্রাধান্য দিচ্ছে বর্তমান মুসলিম শিক্ষিত সমাজ। মুসলিম সমাজে পুরুষ নির্ভরতাবিহীন কোনও একক নারীর অস্তিত্ব প্রায় অসম্ভব।

আধুনিক শহরে বসবাসকারী বহু মানুষই প্রশ্ন করেন, মোল্লাতন্ত্রের নাগপাশ কি পশ্চিমবঙ্গেও রয়েছে। উত্তর, তসলিমা নাসরিন। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব মুসলিম প্রধান অঞ্চলে বাচ্চাদের পোলিও টীকা কর্মসূচী ব্রাত্য কেন? উত্তর— মোল্লাদের দাপটে। পশ্চিমবঙ্গে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীতে মুসলিম সমাজের অংশগ্রহণ কম কেন? উত্তর, মোল্লাদের দাপটে। স্ত্রীশিক্ষার প্রচার প্রসারে মুসলিম মহিলাদের সংখ্যা এত হতাশাজনক কেন? মহিলাদের সামগ্রিক উন্নতিতে মুসলিম সমাজ আজও পিছিয়ে কেন? উত্তর, মোল্লাতন্ত্রের দাপটে। এছাড়া পোষাক, বিবাহ, শিক্ষা নিয়ে নানাসময়ে নানা ফতোয়া তো রয়েইছে।

আজও মুসলিম সমাজে 'নারী' শব্দের অর্থ অবগুণ্ঠন, লাঞ্ছনা, পুরুষ পিতা ও স্বামীর অনুগ্রহভাজন। জলসা করে মুসলিম নারীদের শেখানো হয়, কিছু কপট মৌলবাদীদের দিয়ে, পুরুষের পায়ের নিচেই আছে নারীদের বেহেস্ত। বোরখা না পরার অর্থ, পরপুরুষকে নিজের অঙ্গ প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রলোভিত করা এবং অবশ্যই তার সঙ্গে ইসলাম ধর্মের অবমাননা করা। আসলে ধর্মের নামে অর্ধশিক্ষিত অথবা উচ্চশিক্ষিত মহিলাদের মনে এমন ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যার থেকে মুক্ত হবার উপায় নেই। ভোটের লোভে প্রশাসনও এক্ষেত্রে নিরুপায়। বুলি কপচানো রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরাও এক্ষেত্রে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করেন।

মহিলাদের ক্ষমতায়ন

(৯ পাতার পর)

আসন মহিলাদের কুক্ষিগত হয়ে যাবে, এটাকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না তাঁরা। আধুনিক মহিলা সংগঠনগুলি এটাকে পিতৃতন্ত্রের চাতুরি বলে বর্ণনা করলেও মায়াবতী সম্বন্ধে তাঁরা নীরব। বহুজন সমাজ পার্টি কেন মহিলা সংরক্ষণ বিলের বিরোধিতা করছে— এ প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। মহিলারাই যে মহিলাদের শত্রু, এটা মহিলা সংগঠনগুলি স্বীকার করতেই চাইছেন না। পণপ্রথা ও নারী নির্যাতনের জন্য অনেক ক্ষেত্রে মহিলারাই অপরাধী সাব্যস্ত হন। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগঞ্জে বিরোধী পক্ষকে জব্দ করতে তাদের বাড়ির বৌ-মেয়েদের লাঞ্ছনা করতে উৎসাহ যোগান শাসক দলের মহিলারাই। সিঙ্গুর/নন্দীগ্রামে ধর্ষণ কাণ্ডে শাসক দলের মহিলা কর্মীরা নিশ্চুপ থেকে এই অপরাধকে সমর্থন করেছেন কেন, এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। রাজ্যের মহিলা কমিশনও বহুসময় রাজনৈতিক কারণে মহিলাদের ওপর অত্যাচারে নিশ্চুপ থাকেন—এটা কেন? তাই মহিলাদের আসন সংরক্ষণে প্রধান ভূমিকা নিতে হবে সংসদকে এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলকে।

পরম্পরা

জীবনকথা

মা সারদাদেবী

।। শ্রীশ্রী সারদা মায়ের পুণ্য আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে।।

হরিশ্চন্দ্র দাস

যুগ-যুগান্ত ধরে এই ভারতভূমির শ্যামলশোভন প্রকৃতি, নির্মল বাতাস, ধ্যানমগ্ন হিমালয়, সমুদ্রসাগরনদীপ্রান্তর, দিগন্তবিস্তৃত আধ্যাত্মিক মহিমা ভারতকে করে তুলেছে তাঁর নিজস্ব বিচিত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এখানে স্মরণাতীত কাল থেকে মাতৃরূপে ঈশ্বরের সাধনা করে এসেছেন ভারতের উচ্চকোটি সাধকগণ, যাঁদের ধ্যানে কল্পনায় অনুভূতিতে গভীর সাধনায় পরম বিস্ময়ের লাবণ্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে ঈশ্বরের মাতৃরূপটি। বাঙালীর মাতৃময় চেতনাসত্তায় মা-রূপী দেবীর প্রাধান্য। মাতৃমন্ত্র উচ্চারণে, মা-মা ডাকে বাঙালীর প্রাণে আকুল আবেগে হয়ে ওঠে উদ্বেলিত। পুনরাবৃত্তিতে তার হৃদয় ক্লান্ত হয়ে ওঠে না। এই তো বাঙালীর মাতৃসাধনার সুদীর্ঘ ইতিহাস, বাঙালী তথা ভারতীয় সাধকদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অবদান। বাঙালী সাধক জগজ্জননী দেবী মহাশক্তিকে মানবী মায়ের মধ্যে স্থাপন করে সমগ্র নারীকে দেবী জগন্মাতার প্রকাশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গর্ভধারিণী দেবীর মধ্যে আবির্ভাব জগজ্জননীর, মানবী দেহে দেবীর প্রকাশ।

সাধকের বহু সাধনার সমৃদ্ধ ফসল কামারপুকুরের গদাধর, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব মৃন্ময়মূর্তিকে জাগিয়ে তুলতেন চিন্ময়শক্তিতে, প্রকাশিত হলো মাতৃশক্তির বিশ্বপালিকা রূপের। আপন সহধর্মিনীর মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলেন জগৎপালিকা মাতৃরূপের, মাতৃশক্তির। মা সারদা সমগ্র নারী জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলেন সেই মাতৃশক্তি। মা সারদা হয়ে উঠলেন সকলের মা, যুগ-যুগান্তরের মা। মা সারদাদেবী মন্দিরের মাকে আমাদের মায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করলেন। সারদা, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জায়া হয়ে উঠলেন বিশ্বজননী— মাতৃমহিমামণ্ডিতা শুদ্ধ সত্তা। মানবীসত্তার দেবী সত্তায় উত্তরণ।

চারিত্রিকগুণমণ্ডিতা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আশ্চর্যসুন্দর জীবনধারা লোকশিক্ষার অনন্য উপমা, সর্বজন শিক্ষণীয় অনবদ্য অনুকরণীয় পাঠগ্রন্থ। শ্রীশ্রীমায়ের বহুধা বিভক্ত জীবনীকাব্যখানি সকলকালের সকল শ্রেণীর মানুষকে দেবে ত্যাগ-তিতিক্ষা-ধৈর্যের শিক্ষা, অধ্যাত্মপথের শিক্ষা, মানবতা-মনুষ্যত্বের শিক্ষা, ভালোবাসার শিক্ষা, উদারতার শিক্ষা, সততার শিক্ষা। মা'র জীবনী দেবে ত্যাগের, করুণার, দৃঢ়তার, ক্ষমার, মমতার, সহনশীলতার, আত্মবিশ্বাস, আত্ম-সচেতনতার শিক্ষা। তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনমহিমা, তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা দেবে সুখে-দুঃখে, প্রাপ্তিতে-অপ্রাপ্তিতে, বিপদ-আপদে জীবনের সকল অবস্থাতে অবিচল থাকার শিক্ষা। যুগের পরিবর্তন হয়, মানুষের জীবনযাত্রায় আসে পরিবর্তন।

কিন্তু জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে মানবিক মৌলিক গুণের পরিবর্তন হয় না। সেগুলি অবিচল থেকে মানুষকে সুন্দর করে, সৃষ্টিশীল করে তোলে, মহিমান্বিত করে, মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে। শ্রীশ্রীমায়ের আচার-আচরণে, কথা-বার্তায়, জীবনযাত্রায়, দৈনন্দিন কর্মে, চিন্তায় সেইসব মৌলিক মানবিক গুণগুলির সম্যক বিকাশ ও প্রয়োগ আমাদের মুগ্ধ করে, প্রভাবিত করে, অনুপ্রাণিত করে, সুন্দর করে। আমাদের আত্মপ্রত্যয় বাড়ায়, মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করে। চারিত্রিক মহিমা বিকাশে সাহায্য করে, বিভ্রান্ত মানুষকে সঠিক পথ দেখায়। দেশকালের গণ্ডী পেরিয়ে শ্রীশ্রীসারদা মায়ের দেবোপম আশ্চর্যসুন্দর চরিত্রমাধুর্য মানুষকে শোনাবে আশ্বাসের অমৃতবাণী। বিশ্বজননী সারদাদেবীর জীবন তাই লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে শাশ্বত, চিরন্তনতার আলোকে উজ্জ্বল। সংসারে মানবী, মাতার মন্দিরে মন্দিরে চিরপূজ্যা চির আরাধ্যা দেবীরূপে শ্রীশ্রীসারদামাতার অবস্থান শুধু নয়, ত্যাগ, তিতিক্ষা, সততা, সত্যনিষ্ঠা, মমতা, সাম্যবোধ, মানবতা, মানবপ্রেম, সেবা প্রভৃতি গুণগুলির চিরন্তন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার ভূমিকায় শ্রীশ্রীমা অবতীর্ণ। তাই মানুষের অন্তরাত্মার চিরসঙ্গিনী, দিব্য সত্তার আধার চিরপূজ্যা শ্রীশ্রীমা।

মা দেবী কি না তা নিয়ে বিতর্ক ছিল, কালীমামা আর গিরিশ ঘোষের মধ্যে। কিন্তু সেখানেও লোকশিক্ষার্থে শ্রীমা দেবী সত্তা এবং মানবী সত্তার সমন্বয়, অগাধ স্নেহচ্ছায়ার দৃষ্টান্ত, বিপরীতমুখী দুটি ধারার অসীম শক্তিতে তাঁর অবস্থান। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তো এ দুটি ধারার সমন্বয়সাধনের মূলে। দৃষ্টান্ত আছে, স্ত্রীকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন অনেক সাধক-সন্ন্যাসী, কিন্তু স্ত্রীকে 'মা' বলে গ্রহণ করেছেন, মহাশক্তিরূপে পুজো করেছেন, এ দৃষ্টান্ত নেই। তবু মা সারদাদেবী অবগুণ্ঠিতা, কিন্তু থাকতে পারেননি অবগুণ্ঠিতা হয়ে সহস্র সন্তানের মা-মা ডাকে। মাতৃরূপে শতসহস্র মানুষকে উদ্ধার করলেন, মানুষের সেবা করলেন, বাকি জীবনের চৌত্রিশটি বছর ১৮৮৬ সালে ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর। কত মানুষকে দিলেন আশ্রয়, কত নারীকে দিলেন নবজীবনের আদর্শ শিক্ষা অসাধারণ মাতৃমহিমায়। কত ব্যাকুল মানুষকে দিলেন বৈরাগ্যে দীক্ষা, ঈশ্বরসন্ধানী মানুষকে দিলেন ঈশ্বরসান্নিধ্য লাভের সন্ধান। যারা শোকে দুঃখে হতাশায় জর্জরিত, মা তাদের জোগাতেন আশার আলো। দুঃখে যাদের জীবন গড়া, যারা বঞ্চনার আঘাতে যন্ত্রণাবিদ্ধ, মা তাদের দিতেন নিরাপদ আশ্রয়, অভয় মন্ত্র। মা'র ছিল সর্বভূতে সমদৃষ্টি। তাই জাতপাত মানতেন না। তিনি সকলের মা— সৎ-এরও মা, অসতেরও মা, শরতেরও মা, আবার আমজাদেরও। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির তিনি উজ্জ্বল এক উপমা। মায়ের কাছে ছেলের কী কোনও জাতবিচার আছে? সর্বংসহা মা জানতেন, কীভাবে মানুষকে ভালো করতে হয়, কীভাবে অবহেলিত বঞ্চিত মানুষের সুপ্ত ও ম্রিয়মান হৃদয়লোক জাগিয়ে তুলতে হয় দেবত্বের সম্ভাবনা, মনুষ্যত্বের প্রতিভা, জ্বালিয়ে দিতে হয় আশার দীপাবলী। প্রাচীন ভারতের মহীয়সী নারীগণের সমন্বয় প্রতিমা শ্রীশ্রীসারদাদেবী। যিনি দরিদ্রের কুটিরে জন্মলাভ করেও বিশ্বজননী বিশ্বপূজিতা। শতরূপে শত মহিমায় বিরাজিতা। বিশ্বচেতনায় তাঁর নিত্য উপস্থিতি। তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তৎকালীন সমাজের নানা কু-সংস্কার ও সঙ্কীর্ণ মনোভাবের তিনি প্রতিবাদ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল আন্দোলনের ও সংস্কারকদের তিনি উৎসাহদাত্রী ও সহযাত্রী। তাই আজও আমাদের দৈনন্দিন কর্মে চিন্তায় ধর্মসাধনায় এবং সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানে শ্রীশ্রীমাসারদাদেবী চির প্রাসঙ্গিক, কারণ তিনি চিন্তায় প্রগতিশীল, মানসিকতায় চির আধুনিক।

রোগ প্রতিরোধে ভক্তি কতটা সহায়ক

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

কথায় আছে বিশ্বাস থেকে আসে ভক্তি। ভক্তি হতে মুক্তি। সেজন্য আত্মবিশ্বাস জাগলে সমাধান হয় অনেক সমস্যার।

আত্মবিশ্বাসই মনোবলের উৎস। সেই মনোবল দেয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। যোগশাস্ত্রে রোগ প্রতিরোধের নিদান প্রাণায়াম। প্রাণায়াম আসলে কি? প্রাণ মানে জীবনীশক্তি। আর আয়াম বলতে বোঝায় নিয়ন্ত্রণ। ধীর এবং গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস যোগের ভাষায় প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম শুরুর আগে মানসিক সংকল্প করতে হয়। মন যখন রিল্যাক্স বা আরামপ্রদ অবস্থায় থাকে, দ্রুত গতিতে মনের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। প্রাণায়ামের আগে তাই মনোনিবেশের উপদেশ।

প্রাণায়ামের পরবর্তী পর্যায় ধ্যান। ধ্যানের বিশেষ কাজ কুলকুণ্ডলিনী জাগরণ। আমাদের ব্রেন বা মস্তিষ্ক সংযুক্ত স্নায়ুমণ্ডল মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে কোমর পর্যন্ত নেমে গেছে। স্নায়ুমণ্ডলের বিশেষ অংশ সুষুম্না নাড়ী বা কান্ড। দুধারে নার্ভাস প্লেক্সাস বা স্নায়ুকুণ্ডলী থাকে। এই নার্ভাস প্লেক্সাস স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র ছট্টত্ত্বব্ধপ্সপ্প্রব্ধনন্ত্ত ত্ত্বন্দ্বজ্জ্বপ্সত্তব্দ ত্রঙ্কদ্বব্ধন্দ্বপ্লগ্ন গঠন করে। সিমপ্যাথেটিক বা প্যারাসিমপ্যাথেটিক নার্ভাস প্লেক্সাস অটোমেটিক নার্ভাস প্রোগ্রাম এবং এন্ডোক্রিন গ্ল্যান্ডকে স্পন্দিত করে। ফলে সুনিয়ন্ত্রিত হয় অটোমেটিক নার্ভাস প্লেক্সাস ও এণ্ডোক্রিন গ্ল্যান্ড।

শিশুকাল থেকে শরীর চর্চা, ধ্যান-প্রাণায়াম ইত্যাদির উপর জোর দিলে সারাজীবনে সুফল পাওয়া যায়। রোগ নিয়ে বেশি ভাবলে দেখা দেয় ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ ইত্যাদি। ফল— মনে বিষাদ ও মানসিক চাঞ্চ ল্য। শরীর হয় জরাগ্রস্ত।

শরীর সুস্থ রাখতে জিনের প্রভাব স্বীকৃত। আমাদের দেহের ক্রোমোজমগুলিতে অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা জিন মিউটেশানে বা পরিবর্তনে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ক্রোমোজমের আণবিক ভগ্নাবশেষগুলি জমা হতে থাকে কোষে। কোষ পর্দা হয় ছিন্নভিন্ন। ক্ষতি হয় বেশ কিছু জিনে। স্বাভাবিক কাজকর্ম হয়ে যায় বন্ধ। অপ্রয়োজনীয় কিছু জিন সহসা কাজ শুরু করে। ত্বককোষের কিছু জিন প্রচুর কোলাজিনেজ এনজাইম তৈরি করে। ফলে ত্বককে টানটান রাখতে সচেষ্ট প্রোটিন যায় ভেঙ্গে। জিনগত বিক্রিয়ায় কমে যায় স্মৃতিশক্তি, শ্রবণ ক্ষমতা। বিজ্ঞানীরা ইঁদুর থেকে মানুষ বিভিন্ন প্রাণীর উপর গবেষণা চালিয়ে খুঁজে পেলেন এমন জিন যা বিপাক-ক্রিয়ার হারকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। আমেরিকার বার্ধক্য গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানী রিচার্ড কাটলান এদের নাম দিলেন নেনজেভিটি ভিটারমিনেট জিনস্।"

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের রবিনসন্স গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা সনাক্ত করেছেন সেই 'প্রভু' বা মাস্টার জিনকে যা শত জিনের কাজকর্ম প্রভাবিত করে। এই জিনরাই যৌবনের সমাপ্তি ঘটিয়ে জন্ম দেয় আর্থারাইটিস, ক্যান্সার, অ্যালজাইমারস প্রভৃতি কঠিন ব্যাপার। তাঁরা জিনের নাম দিয়েছেন পি-টোয়েন্টিওয়ান ছত্ল-২১গ্ন।

দেখা গেছে ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা শরীরে ম্যালাটানিন নামে একটি হরমোন উৎপন্নে সাহায্যকারী হয়ে শরীরে তৈরি করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। ভক্তির গুণে ভক্তের শরীর হয়ে ওঠে শক্তপোক্ত। অবশ্য এক্ষেত্রে সুষম খাদ্য গ্রহণের একটি ভূমিকা রয়েছে। সুষম খাদ্যের মধ্যে থাকে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, মিনারেল ও জল। প্রয়োজনে উক্ত উপাদানগুলি কমবেশি করা যায়। কিন্তু বাদ দেওয়া যায় না। না হলে অন্য সমস্যা দেখা দেয়। কারণ বিভিন্ন ধরনের ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ভিটামিন ও মিনারেল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মেটাবলিজিমের জন্য দায়ী। মেটাবলিজিম ঠিক না হলে দেহমনে শক্তি বা সুস্থতা হ্রাস পায়। শরীর ধীরে ধীরে যায় অসুস্থতার দিকে। তবে খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে ভক্তিভরে শান্ত চিত্তে খাদ্য গ্রহণ করলে হজম ভাল হয়। হিন্দুধর্মে তাই খাদ্য গ্রহণ কালে মন্ত্রোচ্চারণ করা নিয়ম। এতে শরীরের মধ্যে মন্ত্রের শক্তিতে পরিপাকের জন্য ক্রিয়াশীল স্নায়ুগুলি স্পন্দিত হয়ে ওঠে।

সবশেষে বলি মানুষের সহজ সরল ঈশ্বরমুখী জীবনযাত্রা জীবনী শক্তি বাড়াতে প্রভূত সাহায্য করে। এর বহু উদাহরণ চারপাশে লক্ষ্য করলে স্পষ্ট ভেসে ওঠে।

(লেখক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হোমিও চিকিৎসক)

বোধ কথা

গো-মাতা কী জয়

কাশ্মীরের স্বর্গগত মহারাজা প্রতাপ সিং ধর্মাত্মা এবং গো-ভক্ত ছিলেন। তাঁর রাজত্বে কোথাও গো-হত্যা হোত না। এমনকী গরুকে কোনওরকম কষ্ট দেওয়া পর্যন্ত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হোত। এবং অপরাধীকে দণ্ডও দেওয়া হোত।

একবার মহারাজ কোথাও যাচ্ছিলেন। সঙ্গে চলেছেন রাজকর্মচারীরাও। রাস্তায় একটা গোরু বসেছিল। কর্মচারীরা আগেই দৌড়ে গিয়ে সেই গোরুকে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলেন।

রাজামশাই কর্মচারীদের দৌড়াদৌড়ির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। একজন বললেন, "মহারাজ, আপনার পাল্কি যে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার কথা, সেই রাস্তায় একটা গোরু বসেছিল। সেটাকে আমরা সরিয়ে দিয়ে আপনার যাওয়ার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছি।"

একথা শুনে মহারাজ প্রতাপ সিং খুব কষ্ট পেলেন। তাঁর জন্য গোরুকে তাড়া করা হোল! তিনি সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা থামিয়ে দিলেন। কর্মচারীদের ডেকে বললেন, "তোমরা ঘোরতর অন্যায় করেছ। তোমরা কি জানো না যে, ক্ষত্রিয় রাজার একমাত্র উদ্দেশ্য হোল গো-ব্রাহ্মণকে রক্ষা করা। গো-ব্রাহ্মণের রক্ষা তথা সেবা করাই মানবতা। তোমরা পবিত্র গো-মাতাকে কষ্ট দিয়েছ। অপমান করেছ। এটা মানবতা নয়, দানবতা। ভবিষ্যতে এরকম কাজ কখনও করবে না।"

উপস্থিত রাজকর্মচারীরা মহারাজের গো-ভক্তি দেখে অবাক হলেন। সবাই বললেন, গো-মাতা কী জয়।

।। চিত্রকথা ।। চালাক কাক ।। ২

বিচিত্র খবর বিচিত্র গল্প

।। নির্মল কর ।।

চাঁদে জলের চিহ্ন মিলতেই বাড়ছে উপগ্রহে জমির দর। এক একর জমির দাম ২০ ডলার। বিক্রি করছে লুনার এমব্যাসি। বহির্বিশ্বে জমি কেনাবেচা নিষিদ্ধ হলেও গত ২৯ বছর ধরে তারা চাঁদে জমি বিক্রি করছে। আইনী অধিকার চেয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে তাদের আর্জি শেষ পর্যন্ত আমল পায়নি।

★ ★ ★

নিউইয়র্কের বাসিন্দা আইরিন প্রুসিক-এর মৃত্যু হয় ২০০৩ সালে। কিন্তু তার পরেও সরকারি সোশ্যাল সিকিয়োরিটি'র টাকা তোলার সময় হলেই তিনি দপ্তরে গিয়ে প্রাপ্য টাকা তুলে নিচ্ছেন। ব্যাপারটা কী? এতদিনে জানা গেল, তাঁর ছেলে টমাস মায়ের মৃত্যুর পর নথিপত্রে কারচুপি করে সরকারের খাতায় আইরিনের নামটা বহাল রাখেন। পরচুলা লাগিয়ে, কষে মেকআপ করে মা সেজে টাকা তুলে আনতেন। ধরা পড়ে গুণধর বলেছেন, মা আমার হাতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন, তাই আমিই আমার মা। গা ছম্‌ছম্ করার মতো যুক্তি!

★ ★ ★

তিমি জলের মধ্যে শব্দ-তরঙ্গ সৃষ্টি করে চমৎকার সঙ্গীতের রূপ দিতে পটু। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ক্যাপিটাল রেকর্ডস্' কোম্পানি তিমি'র সঙ্গীত নিয়ে 'সঙ অব দ্য হাম্পব্যাক হোয়েল' ও 'ডিপ ভয়েস' নামে দুটি রেকর্ড প্রকাশ করেছে।

★ ★ ★

একটা দাঁতের দাম ৭৩০ পাউণ্ড অর্থাৎ কিনা প্রায় ১৪ হাজার টাকা। শুনতে অবাক লাগলেও ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে ওই দাঁতটা বিক্রি হয়েছিল। কিনেছেন এক অভিজাত বংশীয় মানুষ। ভদ্রলোক তাঁর একটি মূল্যবান আংটিতে দাঁতটি বসিয়ে নিয়ে সবসময় পরে থাকতেন। কারণ, দাঁতটা ছিল মহাবিজ্ঞানী আইজ্যাক নিউটনের।

★ ★ ★

উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের উলস্টার গ্রামের বাসিন্দা জেম্‌স টমসন জীবনের ২৯টি বছর স্রেফ শুয়ে কাটিয়ে দেন। ১৯০৭ সালে আয়ারল্যাণ্ডের এক সংবাদপত্র জানায়, টমসন জন্মের পর প্রথম শয্যাত্যাগ করেন ২৯ বছর বয়সে, ১৮৭৭ সালে। তাঁর বয়স যখন ৩০, প্রতিবেশীরা প্রথম টমসনকে বাড়ির বাইরে দেখেন। চিকিৎসকরা তাঁকে পরীক্ষা করে বলেন, টমসন দীর্ঘস্থায়ী আলস্যজনিত রোগে আক্রান্ত। তাই তাঁর পক্ষে আর কিছুই করা সম্ভব ছিল না। এমনকী ইলেকট্রিক শক থেরাপিও টমসনকে কর্মক্ষম করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তিনি জীবনে কখনও শয্যাত্যাগের কথা চিন্তাই করতেন না, যদি না তাঁর অশীতিপর বৃদ্ধা মা তাঁর দেখভাল করতে করতে পুরোপুরি বিছানা নিতেন।

র/ঙ্গ/কৌ/তু/ক

সিংহ — এবার তোমার রক্ত খাব।

মানুষ— কিন্তু তোমাকে দেখে আমার রক্ত তো জল হয়ে গেছে।

সিংহ — তাতেও চলবে, আমি কোল্ড ড্রিংসও খাই।

★ ★ ★

বিধু — অ্যাই সিধু সাবধান, ১৫ বছরের পুরনো বাসে উঠবি না, দূষণে মারা পড়বি।

সিধু — কিস্সু হবে না, ৩২ বছরের পুরনো সরকারের দুঃশাসনে বেঁচে আছি না!

★ ★ ★

প্রথম বৃদ্ধ — আমার ছেলের ব্যবসার সব পরিকল্পনাই শেষে ছাই-এ পরিণত হয়।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ — এটা সত্যিই দুঃখের বিষয়।

প্রথম বৃদ্ধ — দুঃখ করার কিছু নেই। কারণ সে কয়লার ব্যবসা করে।

★ ★ ★

বাবা— তোদের ক্লাসে সবচেয়ে পরিশ্রমী ছাত্র কে রে?

পুত্র — আমি, বাবা।

বাবা — তাই নাকি! কীভাবে?

পুত্র— সবাই বেঞ্চে র ওপর বসে থাকে, আর আমি বেঞ্চে র ওপর দাঁড়িয়ে থাকি।

★ ★ ★

— কী ভোলাবাবু, খাওয়া হোল?

— হ্যাঁ, এই তো খেয়ে উঠলাম।

— কী দিয়ে খেলেন?

— হাত দিয়ে।

—নীলাদ্রি

মগজ চর্চা

১। জোনথেন সুইফট-এর বই 'গালিভার্স ট্রাভেলস্'-এ গালিভারের নাম কী?

২। কোন যুদ্ধে দুর্গার কপাল থেকে মা কালীর সৃষ্টি হয়?

৩। কোন বাঙালী চিত্রপরিচালকের আত্মজীবনীর নাম 'অলওয়েজ বিইং বর্ন'?

৪। মানামা কোন দেশের রাজধানী?

৫। একশ বছর আগে কলকাতার পটলডাঙ্গা পাড়াটাকে সাহিত্যে বিখ্যাত করে গিয়েছেন কে?

—নীলাদ্রি

লিবারহান রিপোর্ট লিক— অভিযুক্ত চিদাম্বরম্

তারক সাহা

আমাদের দেশের রাজনীতিতে একটা প্রথা খুব চালু। সেই প্রথাটা হলো খুব সোজা এবং সেটা হলো সরকার যখন কোনও সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়, তখন বিষয়টাকে ধামাচাপা দিতে কমিশনের আড়ালে ফেলে দেয়—অর্থাৎ ঠাণ্ডা ঘরে ঠেলে দেয়। এতে উদ্ভূত সংকট থেকে সরকার নিষ্কৃতি পায়। আর আমজনতার স্মরণশক্তি এতটাই ক্ষীণ যে, তা দু'দিনেই ভুলে যায়। আবার নতুন কোনও ইস্যু সামনে আসে। মিডিয়া, সংসদ বা বিধানসভায় দু' চারদিন হৈ-চৈ হয় তারপর তা থিতিয়ে পড়ে।

লিবারহান কমিশন এমনই একটা কমিশন। আসলে দেশে বহু অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আছেন, যাঁরা কিছু উপরি আয়ের জন্য মাঝে মধ্যে কোনও রাজনৈতিক দলের ধামাধরা হয়ে যান। আর বিশেষ কোনও ইস্যু এলেই রাজনৈতিকদলগুলির বদান্যতায় এরকম কোনও একটা কমিশনের চেয়ারম্যান হয়ে যান। তারপর চলতে থাকে প্রহর গোনা। মানুষের বিস্মৃতির অতলে চলে যায় সেই ইস্যু আর কমিশনের কথা। লিবারহান কমিশন এর ব্যতিক্রম নয়। দীর্ঘ সতেরো বছর কেটে গেছে। জনগণের করের টাকা খরচ হয়েছে আট কোটি। কোনও নতুনত্ব নেই এই রিপোর্টে কেবল দুটি বিষয় ছাড়া। প্রথমটা হলো, সংসদকে না জানিয়ে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে কীভাবে রিপোর্ট ফাঁস হলো? দ্বিতীয়টা হলো, বাজপেয়ীকে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার কাজে উৎসাহ দেবার দায়ে কমিশন অভিযুক্ত করেছে। দুটো ইস্যু নিয়েই সংসদ তোলপাড়। স্বাধিকারভঙ্গের অপরাধে সব বিরোধীরা এককাট্টা। হৈ হট্টগোলে দু' দিন শীতকালীন অধিবেশন ভণ্ডুল। মারমুখী সাংসদরা ওয়েলে নেমে এসে পরস্পর ধাক্কাধাক্কি করলেন—অসংসদীয় আচরণ টেলিভিশনে দেখে দেখে আমাদের অভ্যেসে পরিণত হয়েছে।

সংসদ ভণ্ডুলের দৃশ্য বিরল না হলেও সাম্প্রতিক ভারত ইতিহাসের বিরলতম ঘটনা হলো, লিবারহান কমিশনের দীর্ঘসূত্রতা। এই মুহূর্তে মানুষ যখন প্রায় ভুলতে বসেছে ঠিক সেই সময়ে ১৭ বছরের পুরানো ঘটনা 'প্যাণ্ডরার বাক্স' থেকে বের করার কোনও অর্থ নেই।

আপামর জনতার কাছে ব্যাপারটা অর্থহীন হলেও দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কানাঘুষোয় যা শোনা যাচ্ছে তা হলো, লিবারহান কমিশনের রিপোর্ট সংবাদ মাধ্যমে নাকি ফাঁস করেছে চিদাম্বরমের দপ্তর। নিন্দুকেরা বলছে যে, এর পেছনেও রাজনৈতিক খেলা রয়েছে। ইউ পি এ সরকার দ্বিতীয়বার ক্ষমতা দখলের পর মনমোহন সরকারের সময়টা ভাল যাচ্ছে না।

দেশের সামনে সবচেয়ে বড় সংকট হলো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি। লোকে বলছে যে, মমতার দু' চারটে ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়া গত ছ'মাসের মনমোহনের রিপোর্ট কার্ড একেবারেই নেতিবাচক। মমতার রেলের সংখ্যা বাড়ানোর পেছনে ইউ পি এ সরকারের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধ তার চেয়ে বেশি হলো ২০১১ সালে সিপিএম বিতাড়নের পথকে সুগম করা। একেবারেই বলা যায় মমতার ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের প্রয়াস।

অর্থাৎ লিবারহান কমিশনের রিপোর্ট এমন সময় ফাঁস হলো যখন সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ইস্যুতে বিরোধী দল ও সরকারি শরিকদলগুলি জোটবদ্ধ। লোকের সন্দেহ বিরোধী শিবিরকে ভাঙতে এটা প্রণব-চিদাম্বরমের এক অপকৌশল নয়তো?

যদি তাই হয়, এই সময়ে বাংলায় সিপিএম যেভাবে কোণঠাসা তাতে নীতি-টিতি দূরে সরিয়ে সিপিএম চাইছে প্রচ্ছন্নভাবে বিজেপির ঘনিষ্ঠ হতে। প্রণব-চিদাম্বরম্ অক্ষ চাইছে বিজেপি-কে বাবরি ইস্যুতে উজ্জীবিত করতে পারলেই বিজেপিকে একঘরে করা যাবে। ভোট রাজনীতিতে বিজেপিকে অন্যদলগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলেই কেল্লা ফতে। না হলে

বৃহস্পতিবার ১৯শে নভেম্বর সংসদে অধিবেশন শুরু হবার পরদিনই ২০ তারিখে আখের সংগ্রহমূল্য নিয়ে সমগ্র বিরোধী শক্তি যখন এককাট্টা ঠিক তখনই ২৩ তারিখে লিবারহান কমিশন নিয়ে সংসদ তোলপাড়। কাকতালীয় ঘটনার মতো ঠিক এই সময়ে মার্কিন সফরে সরকারের প্রধান কর্তাব্যক্তিটি।

দ্বিতীয়ত, ঘরে বাইরে একদম স্বস্তিতে নেই সোনিয়া। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে জিনিসপত্তরের দাম এত অগ্নিমূল্য কোনও

মনমোহন-চিদাম্বরমের হাতে রিপোর্ট তুলে দিচ্ছেন বিচারপতি লিবারহান।

কালেই হয়নি। কোনও সূত্রই মানছে না। দেশের মধ্যে প্রশাসন বলে কিছুই নেই। যে যখন খুশি মানুষ মারছে, রাজধানীর মতো গুরুত্বপূর্ণ গাড়ী হাইজ্যাক হচ্ছে। অরুণাচল, তিববত নিয়ে চীনের হুমকি দেওয়া চলছে। ওবামা চীনকে বলছেন পাক-ভারত সমস্যায় নাক গলাতে। তারপর এমনসব অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা ঘটে চলেছে দেশজুড়ে! অরুণাচলকে চীন তাদের অধিবৃত্ত তিববতের দক্ষিণাংশ বলে অভিহিত করলেও সি পি এম এ বিষয়ে চুপ, অথচ কেবল মার্কিন বিরোধিতার কারণেই ওবামার চীন সফর নিয়ে প্রতীকি বিরোধ ব্যক্ত করেছে সিপিএম।

২৪ শে নভেম্বর সরকার সংসদে লিবারহান রিপোর্ট পেশ করেছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে। লিবারহান রিপোর্টে কী আছে? লিবারহান রিপোর্টে সাকুল্যে ৬৮ জনকে অভিযুক্তরূপে পেশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭ নম্বর স্থানে রয়েছে অটলবিহারী বাজপেয়ীর নাম। ১৭ বছরের লিবারহান রিপোর্টে এটা একটা নতুন সংযোজন। বিভিন্ন মিডিয়ায় আলোচিত হচ্ছে বাজপেয়ীকে কমিশন একবারও তলব না করে কীভাবে দোষী সাব্যস্ত করল? তবে কি লিবারহান বাজপেয়ীকে দোষী তালিকাভুক্ত করে বিজেপিকে সামগ্রিক-ভাবে মসীলিপ্ত করতে চেয়েছেন? প্রশ্ন উঠতে পারে রাজনৈতিক অভিসন্ধির বিষয়টা। কারণ এতদিন বাদে ৬৭ জনকে সারাদেশেই আমজনতা জানে বাবরি মসজিদের ধ্বংসের সঙ্গে যুক্ত বলে। তবে কি একজনকে অভিযুক্ত করতেই লিবারহানের দীর্ঘ ১৭ বছর লেগে গেল? বিজেপি-র বাগী নেতৃবৃন্দ আজও বাবরি মসজিদ বিনাশের বিষয়ে চর্চা হলেই তার দায় তাঁরা প্রত্যেকেই অকপটে স্বীকার করেছেন। অথচ বিজেপি দলত্যাগী যাঁর নাম লিবারহান রিপোর্টে অভিযুক্ত হিসেবে পেশ হয়েছে সেই শঙ্কর সিং বাঘেলাকে কংগ্রেস আড়াল করতে চাইছে।

অদ্ভুত একটা বিষয় সামনে এসেছে। লিবারহান কিন্তু তথাকথিত এই দোষীদের বিরুদ্ধে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার কোনও উল্লেখ করেননি। প্রশ্ন উঠছে আমজনতার কাছে যে কমিশনের এমন প্রলম্বিত রিপোর্ট কেবলই প্রহসন? এসব নিয়ে বেশ কয়েকদিন আলোচনা চলতে থাকবে সংসদে, মিডিয়ায়।

তাহলে বলা যেতেই পারে এমন একটা বহুচর্চিত বিষয় এমন একটা সময়ে সরকার কেন উত্থাপিত করল? এর পেছনে কি তবে প্রণববাবুর পাকা মাথা কাজ করেছে সরকারকে বিভিন্ন ইস্যু থেকে আড়াল করতে? সামনে ঝাড়খণ্ডে নির্বাচন। ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার কোটি টাকা তছরূপের দায়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মধু কোড়ার নাম প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে যাওয়ার বেশ অস্বস্তিতে কংগ্রেস। কংগ্রেসের কাছে এখন মূল বিষয় হলো লিবারহান কমিশন। তা নিয়ে মশগুল অকর্মণ্য বিরোধীরা। একরকম ফাঁদ-ই বলা যায়। এইভাবে বিষয়টা ঝাড়খণ্ডের নির্বাচন অবধি ঠেকিয়ে রাখতে পারলে বিজেপি-র ভাবমূর্তিকে খানিকটা হলেও নষ্ট করা যেতে পারে।

এমনিতে বিজেপি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ঝাড়খণ্ডে। বাবরি মসজিদ ইস্যুটাকে খুঁচিয়ে তোলার লক্ষ্য-ই হলো ওই রাজ্যে সংখ্যালঘুদের মনের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাকে খুঁচিয়ে তুলে জিইয়ে রাখা, অন্ততঃপক্ষে ঝাড়খণ্ডের নির্বাচন পর্যন্ত। এই মুহূর্তে ঝাড়খণ্ড হলো পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। গরীব-গুর্বোদের মধ্যে সস্তায় খাবার জোগাতে ব্যর্থ কংগ্রেসী সরকার এই মূহুর্তে মানুষের দিশাকে ঘুরিয়ে দিতে চাইছে।

তবে লিবারহান ইস্যুটা একটা জবরদস্ত ইস্যু বিজেপি-র কাছে। কৌশলে এই ইস্যুকে নাড়া-চাড়া করতে হবে। ইতিমধ্যে উর্দ্ধমুখী দ্রব্যমূল্য যার ওপর নেই কোনও সরকারি নিয়ন্ত্রণ, মাওবাদী হামলায় দেশ জর্জরিত। বিদেশনীতি নিয়ে বেশ বিপাকে মনমোহন। বেশ মোক্ষম কতগুলি বিষয় সামনে এসেছে। বিজেপি-র সামনে আরও ঐক্যবদ্ধ হবার সুযোগ এসেছে। ফ্লোর ম্যানেজমেন্ট ঠিক হলে আগামী দিনে বিজেপি কংগ্রেসের হতদশাকে কাজে লাগিয়ে থাকলে নিজেদের ঘরে ফসল তুলে আনতে পারবে। সারাদেশ বিজেপি কী করে আগামী দিনে তারই দিকে তাকিয়ে।

তাকে আমি দেখেছিলাম, তোমরা... ?

বিশাখা বিশ্বাস

আমি দেখেছিলাম, সেই লজ্জা—যে
লজ্জায় লাল হয়ে আছে বর্ধমানের
সাঁইবাড়ির সেই জননীর মুখ থেকে
মনুষ্যত্বের অন্তর্মহল, যে লজ্জায়
ইসলামপুরে নিভে গেছিল সম্প্রীতির শেষ
শিখা, যে লজ্জায় জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে
গেছিল মানুষের জীবন-যৌবন গড়বেতায়,
কেশপুরে, নানুরে, সিঙ্গুরে, নন্দীগ্রামে, মঙ্গ
লকোটে। আমি দেখেছিলাম, যে লজ্জায়
কাঁদতেও ভুলে গেছিলেন বিরাটির সেই
ধর্ষিতা মা-বোনেরা, যে লজ্জায় মুখ
লুকিয়ে আজও বেঁচে আছেন সেই ধর্ষিতা
মেহেরবানু কিম্বা নন্দীগ্রামের সেই রূপসী
বিবি ফালুজা। আমি দেখেছিলাম, কোমরে
বেল্ট বাঁধা কয়েক হাজার মানুষকে সাথে
নিয়ে 'গলায় বেল্ট' লাগানো বাবুরা
সাংবাদিকের ছদ্মবেশে কেমন করে মাথায়
রিভলবার ঠেকিয়ে 'সন্ত্রাসী' 'রাষ্ট্রদ্রোহী'
সেই ছত্রধর মাহাতোকে ধরে নিয়ে এসে
তার 'রাজকীয়' সম্পদের সাথে বারেবারে
অনাবশ্যক দ্রুততায় ঘোষিত হয়েছে
মাওবাদীদের সাথে তার যোগাযোগের
সংবাদ। সাংবাদিকরা চাইলেও
ছত্রধরের বিপুল বিত্তের প্রমাণ-দেওয়া
হয়নি।

সদ্য প্রয়াত এক বামবাদী নেতা ২০০৫
সালের নির্বাচনের আগে যিনি সগর্বে
ঘোষণা করেছিলেন তার কেন্দ্রের পরম্পরা
হচ্ছে বাইরের ছেলেদের নিয়ে এসে ভোটে
ভীতিপ্রদর্শন, ভোট-জালিয়াতির
স্ট্যালিনীয় প্রথা এবং তিনি তা তখনো
অক্ষুণ্ণ রাখবেন বলে হুংকার দিয়ে
বলেছিলেন, 'দেখি আমাকে কে
আটকায়'—আমি তখন তাকেও
দেখেছিলাম।...

তা তোমরা কী দেখেছিলে? কেমন
করে বাম-মোহভঙ্গ হয়েছিল রাশিয়ার
চলচ্চিত্র-শিল্পী এবং নাট্যব্যক্তিত্ব সেইসব
দিকপাল আইজেনষ্টাইন, লুনি নেৎসেক,
দামচেস্কো, লুমিমিৎ, কোয়েসলার,
তারকোভস্কি, পস্তারনাক, সোলঝেনিৎসিন
এবং শাখারভেদের—ঠিক যেমন করে
এখানেও বামাবর্ত থেকে বেরিয়ে
এসেছিলেন সৃষ্টিশীল শিল্পী সুভাষ-সলিল-
ঋত্বিক-শম্ভু মিত্ররা, এবং তাদেরই পদাংক
অনুসরণ করে
আনুগত্য ও বিবেকসত্তার সংঘর্ষে জয়ী
বিবেক-কে বুকে নিয়ে দক্ষিণায়নে নেমে
এসেছেন সেই অপর্ণা, শাঁওলী, বিভাস,
শুভাপ্রসন্ন, কৌশিক-আরও কত কত নাম?
তোমরা কী দেখেছিলে, পরিবর্তনের
ঝড়ের দাপটে ভয়ের
প্রাচীর ভেঙে ত্রাসের সংকট কেটে কেমন
করে রুদ্ধ কণ্ঠ মানুষেরা সদর্পে এখন
ছিঁড়ে ফেলছে নব্য-জমিদারদের
পরোয়ানা?

আমি দেখেছিলাম, উন্নয়নের নামে
জল-জঙ্গল, মাটি ও মানুষ কেমন করে
কর্পোরেট দুনিয়ার কাছে বিক্রি হয়ে
চলেছে, কেমন করে বিশ্বভারতীর জমি-
জায়গা খোয়াই সব প্রমোটারের পদতলে
অর্পিত হয়ে গেছে, কেমন করে শিবতলার
কয়েক'শ একর বহুমূল্যবান জমি শিল্পের
নামে কৃষকের হাতছাড়া হয়েছে, কেমন
করে কিশোর কবির ভ্রাতুষ্পুত্র এখন
'ধনতান্ত্রিক উন্নয়নের নামই আমাদের
মার্কসবাদ' বলতে আর লজ্জিত হন না
এবং ধনতান্ত্রিকের সহস্র কোটি ডলার
তাতে পাওয়ার আশ্বাসে মধ্যরাত্রির
জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে এখন আমরা বলি ঃ
এস ই জেড-এর নবীন পৃথিবীর জন্যে
'ফুল ফুটুক না ফুটুক, আজ বসন্ত'। আমি
দেখেছিলাম, যে টেকটনিক আলোড়নের
ফলে হিমালয়ের উত্থান হয়েছিল, যে
টেকটনিক আলোড়ন না হলে তেত্রিশ
বছরের কুম্ভকর্ণদের নিদ্ টোটে না, সেই
আলোড়নেই আজ কেমন করে বেড়ে
চলেছে ২৪ ঘণ্টা কথিত ঘোঁট নয়, আসলে
তা কংগ্রেস তৃণমূলের জোট।...

তা' তোমরা কী দেখেছিলে, চটিপরা
সেই পুলিশেরা নন্দীগ্রামের সেই
আফরোজ বেগমকে ধর্ষণ করে খুন করার
পরই কেমন করে বলেছিল 'কাউকে পাছা
দেখানোয় দোষ কী' কিম্বা মহাশ্বেতা
অপর্ণা কৌশিকেরা সবাই অস্ত্র বয়ে
বেড়াতো? তোমরা কী দেখেছিলে, ভল্গার
জলে-সারে পুষ্ট বাংলার ছেলেরা গঙ্গায়
ডুব দিয়ে এসে কাউকে খুন করার পরই
কেমন করে প্রত্যক্ষদর্শীর বুকে পিস্তল
ঠেকিয়ে বলেছিল 'মনে রাখবেন, আপনি
এসব কিছু দ্যাখেননি'? তোমরা কী
দ্যাখোনি, অন্তঃসত্ত্বা সেই জননীকে
নির্বাচনের আগে পেরেকপোঁতা বাঁশ দিয়ে
লাল-কালচারে লালিত বাংলার যুবকেরা
কেমন করে পিটিয়ে খুন করেছিল?
নাজিবুল ইসলাম নামের
সেই শিশুটি মায়ের বুকে দুধ খেতে খেতে
যে বোমার আওয়াজে তিনবার মাত্র কেঁপে
উঠেই কেমন করে বারুদের গন্ধ শুঁকতে
শুঁকতেই মারা গেছিল
কমরেড, তাও কী তোমরা
দ্যাখোনি?...

(জ্যোতিষ নয়, এ্যাসট্রোনমির)
পুরুষকারে আস্থাভাজন, প্রতিবন্ধকতা
প্রতিরোধে উদ্যোগী সেই 'ট্র্যাজিক
হিরো'—নিজস্ব দুঃসময়ে এবং নিশ্চিত
পরাভবের দিকে যিনি নিয়ত ধাবমান,
আপন অন্তর্বিরোধে তার একান্ত নিজস্ব
দ্বৈতসত্তার সংঘর্ষে, 'টু বী অর নট টু বী'-র
সেই শাশ্বত টানাপোড়েনে যিনি নিত্য
ক্ষয়িষ্ণু,—কমরেড, তাকেও কী তোমরা
এখন দেখতে পাচ্ছো?...

বলো তো!...

রঙ্গম

কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে ধরা পড়ল নাৎসী ও কমিউনিস্টদের নানান কুকীর্তি

বিকাশ ভট্টাচার্য

১০ থেকে ১৭ নভেম্বর হয়ে গেল পঞ্চ দশ কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব। প্রদর্শিত হলো ৫৬টি দেশের ২২৮টি ছবি। উদ্বোধন করলেন পরিচালক মণিরত্নম্‌। মঞ্চে

পরিচালিকা মার্থা মেজারস

বরাবরের মতো মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেবের পাশে ছিলেন বৃদ্ধ জীবী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তরুণ মজুমদার এবং ডজনখানেক আমলা। ছিলেন না আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্রকার ঋতুপর্ণ ঘোষ, অপর্ণা সেন, গৌতম ঘোষ, অঞ্জন দত্ত। এঁরা পরিত্যাজ্য। কারণ নন্দীগ্রামের গণহত্যার প্রতিবাদে এঁরা সোচ্চার হয়েছিলেন। বরাবরের মতো মঞ্চে দেখা গেল না মৃণাল সেনকে। কারণ তিনিও গৌতম ও অঞ্জনকে পাশে নিয়ে মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন। তিনি প্রেক্ষাগৃহের সামনের সারিতে বসে বলে ফেললেন 'আমি অধঃপতিত'।

২২৮টি ছবি ভাগ করা হয়েছিল কয়েকটি বিভাগে। সেন্টিনারি ট্রিবিউটে দেখান হলো বিমল রায় ও আমেরিকার এলিয়া কাজানের ছবি। হোমেজ বিভাগে ছিল ইতালির ফেদেরিকা ফেলিনি, ব্রাজিলের রোজারিও, আফ্রিকার প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মানে ভূষিত সেনেগালের ওসমান সেম্বেন এবং তুর্কির ইলমাজ গুণের কিছু ছবি। অনার পর্বে দর্শকরা দেখলেন পোলাণ্ডের আন্দ্রেঁ ওয়াজদা, হাঙ্গেরির মার্থা মেজারস ও জার্মানীর ক্যারলিন লিঙ্কের ছবি। ডিসকভারি বিভাগে ছিল গ্রীসের পানাতো পোলোসের ছবি।

মেক্সিকো ইন ফোকাস বিভাগে দেখানো হয়েছে কার্লোস কাররো, রডরিগো প্লা, ফার্নান্দো এমব্যক ও কার্লোস রেগাডাসের ৭টি বলিষ্ঠ ছবি। একদিকে সনাতনী ভাবধারা, অপরদিকে নতুন প্রজন্মের নতুনত্বের সন্ধানে এক প্রবল ভারসাম্যহীনতায় জর্জরিত মেক্সিকোর এইসব তরুণ চলচ্চিত্রকার দৃপ্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তাদের আপোষহীন মনোভাব, ব্যতিক্রমী দৃষ্টিভঙ্গী। এই প্রতিবেদকের উৎসবের বেশকিছু ছবি আগেই দেখা ছিল। তবে না দেখা ছবির মাত্র যে কটি ছবি দেখা সম্ভব হয়েছে তারই কিছু বর্ণনা দিই। আমার মূল আকর্ষণ ছিল 'রিমেম্বারিং ওয়ার্ল্ডওয়ার টু'-র কয়েকটি ছবির ব্যাপারে। উৎসব অধিকর্তা নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "এই পরিচালকেরা কেউই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেননি, অনেক পরে তাঁদের জন্ম, অথচ ব্যক্তির ওপর নেমে আসা সন্ত্রাস ফুটিয়ে তুলতে কি তন্নিষ্ঠ তাঁরা।" এঁদের ছবিতে ধরা পড়েছে নাৎসী জমানার অত্যাচার, লালফৌজের কুকীর্তি—যেখানে তীব্র ক্ষমতালিপ্সায় পার্টিই যেন শেষ কথা।

উদ্বোধনী ছবি

উৎসবের উদ্বোধনী ছবি মার্ক হারম্যানের 'দ্য বয় ইন স্ট্রাইপড্ পাজামা' (ব্রিটেন ২০০৮)। ব্রুনো, এক উচ্চপদস্থ নাজি অফিসারের ৮ বছরের ছেলে। কর্তব্যরত বাবার সঙ্গে সেও আসে এক কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। আটক সকলকেই সেখানে চেককাটা পাজামা পরতে হয়। এখানেই ব্রুনোর সঙ্গে স্মুয়েল নামে এক ইহুদি শিশুর বন্ধুত্ব হয়। একজন কাঁটাতারের এপারে, অন্যজন ওপারে। ব্রুনো কোনওমতে একটা

দ্য বয় ইন্ দ্য স্ট্রাইপড পাজামা

স্ট্রাইপড্ পাজামা জোগাড় করে লুকিয়ে ক্যাম্পে ঢোকে। ব্যাপারটা কি জানতে ব্রুনো আর স্মুয়েল দুজনেই গ্যাস চেম্বারে ঢুকে পড়ে। ইতিমধ্যে ব্রুনোর বাবা খবর পেয়ে ছুটে আসেন। ততক্ষণে সব শেষ।

এ উইম্যান ইন বার্লিন

ম্যাক্স ফেবারবয়েকের এই ছবি (জার্মানি ২০০৮) সুইজারল্যাণ্ডে ১৯৫৯-এ প্রকাশিত

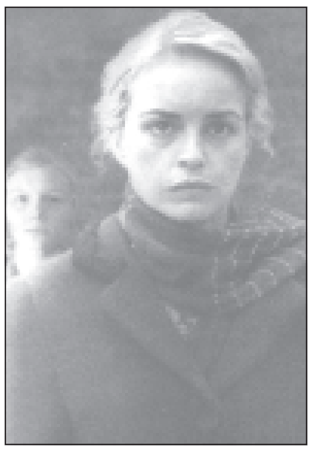

এ উইম্যান ইন বার্লিন

প্রত্যক্ষদর্শী এক মহিলা সাংবাদিকের ডায়েরি থেকে তৈরি এক বিতর্কিত তথা ভয়ঙ্কর ছবি। যুদ্ধের শেষে যখন নাৎসী জার্মানদের হারিয়ে বার্লিনের দখল নেয় লালফৌজ, তখন তাদের জয়ের উল্লাসে একের পর এক ধর্ষণের শিকার হতে থাকে সেই শহরের মেয়েরা। ১৯১৭তে রুশ বিপ্লব অনেক নৈতিকতার ধুয়ো তুলেছিল। অথচ ১৯৪৫-এ লালফৌজের এই আচরণে হিংস্র স্তালিন জমানার এক নগ্নরূপ আমাদের চোখে পড়ে।

দ্য আনবেরিড ম্যান

দ্য আনবেরিড ম্যান (হাঙ্গেরি, ২০০৪) -এর পরিচালিকা মার্থা মেজারস ভীষণভাবে স্তালিন জমানার বিরুদ্ধে। বছর ত্রিশ-চল্লিশ আগেও সোভিয়েত ব্লকের অধীন দেশগুলিতে রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল তুঙ্গে। এই অস্থির সময়ে মার্থা মেজারস আপোষহীনভাবে তৈরী করেছেন একের পর এক প্রতিবাদী ছবি। দ্য আনবেরিড ম্যান ছবিতে দেখি জেলের অন্ধকার কুঠুরিতে এক প্রৌঢ়, যে নিজেকে হাঙ্গেরির প্রেসিডেন্ট বলে দাবী করে কাগজ-কলম চাইছে তার বক্তব্য লিখে জানাতে। কাগজ-কলমের বদলে সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হল। মুখে বিদ্রূপের হাসি ঝুলিয়ে যে বলল, শেষ ইচ্ছেটা কাগজে লিখতে চেয়েছিলাম। আমি গণতন্ত্র চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম পার্টি ডিকটেটরশিপের অবসান। আমার বিচার করবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। মার্থার অন্য এক ছবির নায়িকা সিনেমা নিয়ে পড়াশোনা করে দেশে ফিরেছে। দেশে এক দমবন্ধ করা পরিবেশ। কমিউনিস্ট সরকার তাদের পছন্দসই চিত্রনাট্য না হলে সিনেমা বাতিল করে দেয়। কোনও ছবিতে মার্থা দেখিয়েছেন স্তালিনের মৃত্যুর পর ১৯৫৬ সালে হাঙ্গেরির জন-অভ্যুত্থান। স্তালিনের মূর্তি উপড়ে ভাঙ্গছে ছাত্ররা। মার্থার বয়স এখন ৭৮। উৎসবে এসেছিলেন। ত্রিশের দশকে স্তালিনের ডাকে নতুন পৃথিবী গড়ার স্বপ্ন নিয়ে মার্থার বাবা-মা কিরঘিজস্তানে গিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে স্তালিন জমানার সিস্টেমের বিরোধিতা করায় মার্থার বাবাকে জেলে পুরে খুন করা হয়। সেদিনের ছোট্ট মার্থা আজ নিজের অভিজ্ঞতায় হয়ে উঠেছেন আপাদমস্তক কম্যুনিস্ট বিরোধী।

উৎসবে পোস্টার বিতর্ক

ভয়ঙ্কর রুচিহীন এক অশ্লীল পোস্টার কলঙ্কিত করল এবারের উৎসব—সেইসঙ্গে সত্যজিৎ-ঋত্বিকের মতো বরেণ্য দুই চলচ্চিত্রকারকে। উৎসবের পোস্টারে ব্যবহৃত হয়েছে নগ্ন এক নারীদেহ। আর তারই পাশে রয়েছে সত্যজিৎ ও ঋত্বিকের ছবি। বুদ্ধবিরোধী বলে ইতিমধ্যেই যেসব শিল্পীরা নিজেদের চিহ্নিত করে নিয়েছেন সেই শুভাপ্রসন্ন, জয় গোস্বামী, শতাব্দী রায়, ব্রাত্য বসু, সুপ্রিয়া চৌধুরী, কৌশিক সেনেরা এই সুযোগে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। ব্রাত্য বসু আরও কয়েকধাপ এগিয়ে বলেছেন, 'এটা সিনেমাপ্রেমীদের কোনও উৎসব নয়। এখন এই উৎসব পরিণত হয়েছে ব্যক্তিগত (পড়ুন বুদ্ধবাবুর) এক উৎসবে। দু-একজন ব্যক্তিবিশেষের ফুর্তি করার জায়গা হয়েছে নন্দন। ফলে অশ্লীল অনেক কিছুই ঢুকে পড়ছে চলচ্চিত্র উৎসবে।' মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

শব্দরূপ - ৫২৮ ইন্দ্রনীল সিনহা

১	■	২		৩	■	৪	■
	■		■	৫			■
৬			■		■		■
	■	■	■	■	৭		৮
৯	১০		■	■	■	■	
■		■	১১	■	১২		
■	১৩			■		■	
■		■	১৪			■	

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. হনুমান এর মাতা, ৫. সরস, প্রথম দু'য়ে পৃথিবী, ৬. পুরাণে কথিত মর্ত্যের নিচের দেশবিশেষ, ৭. এই কাপড়টি পুজোর ঘটের উপর থাকে, আগাগোড়া পিলসুজ, ৯. ব্যাধ, শেষ দুয়ে আশীর্বাদ, ১২. বিভীষণ পত্নী, ১৩. এই নগরে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসে ছিলেন, ১৪. পদ্মফুল।

উপর-নীচ ঃ ১. শিব ও গৌরী, তিনে ঠ্যাং, ২. বায়ু, বাতাস তৎসম শব্দে, ৩. এই দেবর্ষি কলহ-সংগঠক বলে খ্যাত, ৪. কৃষ্ণের অগ্রজ, ৮. বলির প্রচলিত নৈবেদ্য যা হিন্দুদের সুখাদ্য বিশেষ, ১০. অরণ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, ১১. তৎসম শব্দে পল্লব, গাছের শাখা বা ডাল, ১২. তৎসম পদ্মফুল।

সমাধান শব্দরূপ - ৫২৬

■	যা	দ	ব	■	অ	ল	কা
■	গ	■	সু	■	ন্যা	■	না
অ	■	■	প	র্জ	ন্য	■	ই
ম	তি	গ	তি	■	■	■	ব
র	■	■	■	শ	শী	ক	লা
ক	■	উ	মে	শ	■	■	ই
ণ্ট	■	দ্ধ	■	ধ	■	কু	■
ক	র্ত	ব	■	র	ট	ন্তী	■

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

শ্যামল দাস
বেলেঘাটা, কলকাতা-১০

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

● ৫২৮ সংখ্যার সমাধান আগামী ২১ ডিসেম্বর, ২০০৯ সংখ্যায়

ভারতই একমাত্র দেশ যেখানে একটি মন্দিরের জন্য ৪০৬ বছর ধরে সংগ্রাম চলছে

(১ পাতার পর)

উথলে ওঠে রামমন্দির ভেঙ্গে তার উপর গড়া বাবরি মসজিদের জন্য?

বিধর্মীর মঠ-মন্দির-মূর্তি ধ্বংস করে তার উপর মসজিদ, মাজার, মকবরা তৈরি করাই ইসলাম ধর্মের জেহাদী নির্দেশ এবং ওই ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদ স্বয়ং সে কুকর্মের নির্দেশক ও পথপ্রদর্শক। তাঁর চোখের সামনে তার অনুমোদনে মদিনায় যে গণহত্যা ঘটে তার বিবরণে দেখা যায়ঃ

"মদিনার কুরাইজরা খন্দকের যুদ্ধে নবীকে সাহায্য না করে, করেছিল নবীর শত্রু কোরেশ বাহিনীকে। এই অপরাধের জন্য নবীর ইঙ্গিতে তাঁরই প্রতিনিধ সা'দ ইবনে মুয়াধ কুরাইজদের যে শাস্তি দিয়েছিলেন তা হচ্ছে, 'সব পুরুষদের হত্যা করা হবে এবং কুরাইজদের অস্থাবর সম্পদ (গণিমতের মাল) সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করা হবে।'

'যেদিন এই রায় দেওয়া হয়, সেদিন রাতে মদিনা বাজারের কাছে ৮০০ লোককে কবর দেবার মতো গর্ত খোঁড়া হল এবং রাত শেষ হলে ভোরের নামাজ পড়ার পরপরই ওদের কোতল করার কাজ শুরু হয়। ঘাতকের ভূমিকায় ছিল আলি এবং তাঁর এক চাচাত ভাই জুবায়ের। প্রকাশ্য দিবালোকে শত শত সাধারণ মানুষের সামনে এই কোতল পর্ব চলে। সমস্ত দিন ধরে নবী স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থেকে প্রবল মানসিক শক্তির পরিচয় রেখেছেন। ওই যুদ্ধে প্রাপ্ত সম্পদ চার ভাগে ভাগ করা হয়—জমিজমা, অস্থাবর দ্রব্যাদি, পশু এবং ক্রীতদাসী (শিশু বাদে এক হাজার)। মহানবী এর প্রত্যেকটির পাঁচ ভাগের এক ভাগ নিজে রেখে কয়েকজন মহিলাকে তাঁর সাঙ্গপাঙ্গোদের উপঢৌকন দিলেন। অপর মহিলা ও শিশুদের বিক্রির জন্য মেজদ-এ পাঠিয়ে দিলেন।' (সূত্র ঃ দ্য লাইফ অফ মহম্মদ বাই স্যর উইলিয়াম মুইর, পৃঃ ৩১৬-৩২২)। আর আমাদের মক্কাবাদী সিপিএম সরকার পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছেঃ

"মহম্মদ সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন।...তিনি পৌত্তলিকতার বিরোধী হলেও পৌত্তলিকদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন না। পরাজিত শত্রুর সাথে সব সময়ই উদার ব্যবহার করতেন। এমনকি জোর করে ধর্মান্তরিত করার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন" (পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ৭ম শ্রেণীর ইতিহাস, পৃঃ ২৪)। এই গ্রন্থের লেখক আরও লিখেছেন—"ইসলামের সরল ধর্মমত, সুবিচার ও সাম্যের আদর্শ এবং সহনশীলতার নীতি মানুষকে সহজেই আকৃষ্ট করত" (পৃঃ ২৫)।

স্বয়ং ওস্তাদের যখন এই চরিত্র, তখন চেলাদের চরিত্র যে তদনুরূপ হবে তাতে আর আশ্চর্য কি? আর সে পথ লক্ষ্য করেই মুসলিম শাসনে সারা ভারতবর্ষে তিন হাজারের উপর মঠ মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে। পাকিস্তান কায়েম করতে গিয়ে পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানে এবং পরে বাংলাদেশে কত মন্দির, ঠাকুর ঘর, কালীতলা, চণ্ডীতলা, শিবতলা, হরিবাসর নষ্ট করা হয়েছে তার সংখ্যা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। যেহেতু হিন্দুরা প্রতিবাদে সমসংখ্যক মসজিদ মাজার ভাঙেনি, তাই মন্দির ভাঙাটা মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকারে দাঁড়িয়েছে। হিন্দুরা পরধর্মদ্বেষী নয় বলেই এবং কারো উপাসনা স্থান ধ্বংস ও অপবিত্র করা বর্বরোচিত কর্ম বলে মনে করেই ৭০০ বছর এই ধর্মীয় অত্যাচার সহ্য করে গেছে।

যুগ যুগ ধরে হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান রূপে গণ্য অযোধ্যার রামমন্দিরের উপর মোগল সম্রাট বাবরের কুদৃষ্টি পড়ে এবং সেটিকে ভেঙে তার উপর বাবরি মসজিদ গড়ে তোলে। কিন্তু রাম-সীতার চরণধূলি স্পর্শ-ধন্য রামমন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার মতো বর্বরতা হিন্দুরা মাথা পেতে নেয়নি। বারে বারে প্রতিরোধ করেছে, লাখে লাখে আত্মাহুতি দিয়েছে—ইতিহাসে তার প্রমাণ রয়েছে—

"দুই ফকিরের নির্দেশে বাবর তাঁর অন্যতম সেনাপতি মীর বাঁকি তাসখন্দিকে আদেশ দিলেন সসৈন্যে মন্দির আক্রমণ করতে। মীর বাঁকি মন্দির আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন হংসবরের রাজা বিজয় সিংহ, মকরহীর রাজা সংগ্রাম সিংহ;ফেজাবাদ জেলার ভিটি রাজ্যের রাজা মহতাব সিংহ। ঐতিহাসিক ক্যানিংহাম লিখেছেন : রাজজন্মভূমির ধ্বংস উদ্যোগ দেখে ঐক্যবদ্ধ ভাবে হিন্দুরা মোগল অস্ত্রের সামনে বুক পেতে দেয়। একলক্ষ চুয়াত্তর হাজার হিন্দু নিহত হওয়ার পর মীর বাঁকি খাঁ কামানের সাহায্যে মন্দির ধ্বংস করে দেয়। বারাবাংকি জেলার গেজেটিয়ারে হ্যামিল্টন সাহেব লিখেছেন ঃ হিন্দুদের রক্ত আর চর্বি দিয়ে চুন সুরকি মেখে মসজিদের ভিত্তি তৈরি করার জন্য জালাল শা ইট সরবরাহ করেছিল। বাবর নিজেই আত্মজীবনীতে লিখেছেন ঃ কালান্দার শার নির্দেশে রামচন্দ্রের জন্মভূমিকে ধ্বংস করে আমি মন্দিরের মশলা দিয়ে ওখানেই মসজিদ নির্মাণ করিয়েছি।

বাবরের নিজের উক্তি ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ রাম মন্দিরের স্বপক্ষে থাকা সত্ত্বেও যে নির্বোধেরা বিতর্ক তুলছে, তারা মোটেই নির্বোধ নয়, সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ভাবেই তারা এটা বলছে। শুধু সত্য এবং তথ্যই নয়, এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে এক মহাসংগ্রামের ইতিহাস এবং অতুলনীয় আত্মত্যাগের অভূতপূর্ব কীর্তি। ১৫২৮ খ্রীস্টাব্দে এই সংগ্রামের শুরু, আর শেষ হয়েছে ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে। শেষ হয়েছে একথা বলার সময় বোধহয় এখনো আসেনি।

পৃথিবীতে ভারতই বোধ হয় একমাত্র দেশ যেখানে একটি মন্দিরের জন্য সংগ্রাম চলে ৪০৬ বছর ধরে। আত্মদান করে মোট তিন লাখেরও বেশী হিন্দু।"

(বাবরী মসজিদ আমাদের চাই—শিবপ্রসাদ রয়)

ইউরোপের ইতিহাসে শতবর্ষের যুদ্ধ, গোলাপের যুদ্ধ নিয়ে কত কাহিনী কত বীরত্ব-গাথা রচিত হয়েছে। কিন্তু ৪০০ বছর ধরে একটা মন্দির নিয়ে শাসক মুসলমান ও শাসিত হিন্দুদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছে, তা নিয়ে সেকুলার নামক জারজ হিন্দুদের কোনও গর্ববোধ নেই; বরং তারা ওই জায়গাটা মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়ে জন্মদাতার মনস্তুষ্টি করতে তৎপর।

কবি মধুসূদন মনে হয় এই নষ্ট চরিত্র লোকদের লক্ষ্য করেই বলেছিলেন—সমাজে এমন চরিত্রের লোকও আছে যারা অর্থের জন্য নিজের মা-বোনকেও বিক্রি বা বন্ধক দিতে দ্বিধা করে না! জয় শ্রীরাম।

অযোধ্যায় প্রস্তাবিত রামমন্দিরের মডেল।

রাজস্থান বিজয়ে বিপর্যস্ত রাহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ রাজস্থান বিজয় করতে গিয়ে বেশ অস্বস্তিতে পড়েছিলেন কংগ্রেসের মহামন্ত্রী (সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক) এবং দলীয় নেতাদের আরাধ্য রাহুল গান্ধী স্বয়ং। রাজস্থানে স্থানীয় স্তরে বিভিন্ন পৌরসভা ও স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে প্রার্থীতালিকা স্থির হচ্ছিল। প্রথম কর্মী বৈঠকেই রাহুলের উদ্দেশ্যে ধেয়ে আসে প্রশ্ন—যাদের কংগ্রেস দলের সঙ্গে কোনও সংশ্রবই নেই, শুধুমাত্র নেতাদের আত্মীয়, তাদেরকেই টাকা নিয়ে দলীয় প্রার্থী করা হচ্ছে কেন? উত্তরে রাহুল বললেন, 'এবার থেকে আর হবে না। এখন থেকে দলীয় স্তরে সাংগঠনিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে কার্যকর্তা এবং প্রার্থী স্থির হবে।' এক্ষেত্রে প্রকারান্তরে টাকা নিয়ে টিকিট দেওয়ার কথা রাহুলজী একপ্রকার স্বীকার করে নিলেন বলা যায়। পরের প্রশ্নটাই ছিল—কীভাবে যুবকদের আরও বেশি করে রাজনীতিতে সক্রিয় করা যায়? তার উত্তরে যুবনেতা রাহুলবাবু দুটি পদ্ধতির কথা বলেছেন—'নমিনেটেড অ্যাণ্ড ইলেক্টেড'। রাহুলের বক্তব্য, ভারতে বন্ধ দরজার ভিতরে 'নমিনেটেড' পদ্ধতিই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চালু আছে। তাঁর অভিমত হল, স্বাভাবিক নির্বাচনের মাধ্যমেই যুবকরা সামনের সারিতে আসতে পারে। কেউ বাইরে থেকে ঢুকিয়ে না দিলেই ভালো হয়। যুবকদের সামনে নিয়ে আসতে হলে তাদের হাতেও ক্ষমতা দিতে হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিযুক্তিতে সংরক্ষণের কোটার জন্য মেধাবীরাও সুযোগ থেকে

বঞ্চিত হচ্ছেন—এজন্য কি করা উচিৎ? এই পদ্ধতি ভালো বা মন্দ—তা নিয়ে কোনও মন্তব্যই করতে চাননি রাহুল। তিনি শুধু বলেছেন, সংরক্ষণ কোনও ইস্যু নয়। আসন সংখ্যা বাড়ানো উচিৎ। এবং সেই প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়ে দেন। উদাহরণ হিসেবে বলেন, দেশের জনসংখ্যার ভিত্তিতে কতজন কার্ডিওলজিস্ট আছেন আর কতজন থাকা উচিৎ ছিল তা দেখতে হবে।

রাজস্থানী যুবকরা ব্যাপক সংখ্যায় বেকার। এপ্রশ্নে রাহুল দৃশ্যতই পিছু হঠেন। রাহুলের ইঙ্গিতে আসরে এলেন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহ্লট। তিনি বলেন, বসুন্ধরা সরকার ৯০০ কলেজকে অনুমোদন দিয়েছে। প্রতিবছর অন্ততঃপক্ষে ৯০ হাজার শিক্ষিত যুবক উঠে আসছে। তাদেরকে কাজ দেওয়ার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই। প্রকারান্তরে গেহলট বসুন্ধরা সরকারকে শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্যের সার্টিফিকেটটা একরকম দিয়েই দিলেন। অন্যভাবে বললে, অশোক গেহলটরা (পড়ুন কংগ্রেস) হয়ত চান না দেশের মানুষ শিক্ষিত হোক। এবার প্রশ্ন এল শিক্ষা নিয়ে। প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাস-ফেল তুলে দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার ভিতটাই মজবুত হচ্ছে না। এটা কি ঠিক? এর উত্তরে রাহুল বলেন, ফেল করলে কী ভিত মজবুত হবে? অস্যার্থ—ছাত্ররা ফেল করে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হলেও কংগ্রেসের আপত্তি নেই। রাহুলের এই মন্তব্যে পাস-ফেল প্রথা তোলা পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্যই খুশী হবে—একথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

Swastika
7 December - 2009, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registered No. SSRM/Kol. RMS/W.B./RNP - 048/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
L.No. MM&P.O. - SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-021/2007-09

ভারতেন্দু অন্ধ আশ্রম

মঙ্গলভাবনা অমঙ্গলহারী

বাসুদেব পাল : কলকাতার বিখ্যাত কলামন্দির প্রেক্ষাগৃহের মূল মঞ্চে বসে একজন গাইছে—মঙ্গলভাবনা অমঙ্গলহারী...। সুরের মূর্ছনা কানে যেতেই সভাগারে উপস্থিত কয়েকশ' শ্রোতার চমকে উঠার অবস্থা। না, যিনি গাইছেন তিনি সুরকার, গীতিকার ও গায়ক রবীন্দ্র জৈন নন, তবে গায়কের গলার সঙ্গে মিল বেশ খানিকটা। আরও একটা জায়গায় মিল আছে—গায়ক রবীন্দ্র জৈনের মতোই অন্ধ। গত ২৯ নভেম্বর, এক সুরসন্ধ্যার আয়োজন

হরি বিয়োমের সঙ্গে কলামন্দিরে অনুষ্ঠানরত অন্ধ শিল্পীবৃন্দ।

করেছিলেন কলকাতার বিখ্যাত সাংস্কৃতিক সংস্থা 'সুরভিকা'। সুরভিকা'র পক্ষে অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণকর্তা সংস্থার সভাপতি শিবকুমার পারিখ এবং সম্পাদক বিশ্বনাথ চাণ্ডক যেহেতু সুপরিচিত কোনও ব্যক্তিত্ব নন, চটুল নাচগানের আসরও নয়, সেজন্যই হয়তো বা শ্রোতার সংখ্যা চোখে পড়ার মতো নয়। তবে গায়কদের একটাই সুবিধা, তাঁরা কেউই চোখে দেখেন না।

গান তো সবাই গাইছেন—একই সঙ্গে একজন তবলায় ওস্তাদের মতোই সঙ্গত করছেন, ক্যাসিও, হারমনিয়াম, খঞ্জনীও দক্ষতার সঙ্গে যাঁরা বাজিয়ে চলেছেন তারা সবাই এই সুন্দর পৃথিবীর দৃষ্টিসুখ থেকে বঞ্চিত। দীপক কুমার, সিজু পাণ্ডে, মণ্টু দাস (তবলা), বাপী দাস (হারমনিয়াম) এবং খঞ্জনীতে নীলকণ্ঠ দাস। দলের মধ্যে শ্যামল দাস সর্বকনিষ্ঠ, জন্ম থেকেই পঙ্গুও। সেই শুরু করেছিল প্রথমে। মঞ্চে একমাত্র চক্ষুষ্মান হলেন—হরি বিয়োম। তিনি ভাষ্য পাঠ করছেন, আবার তিনিই মূল গায়ক। এই অন্ধ-শিল্পীদলের 'গুরুজী'—শুধু প্রশিক্ষক নন, আশ্রয়দাতাও।

স্বল্প সময়ের মধ্যে (মাত্র দেড় ঘণ্টা) তুলসীদাস বিরচিত রামচরিতমানস-এর চৌপাই-এ রীতিমতো সুরারোপ করে প্রায় পুরো রামায়ণটাই তুলে এনেছেন। ঋষি বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের বনগমন থেকে মায় রাবণ-বধ পর্যন্ত। অনুষ্ঠানের শুরুতে সুন্দর সুললিত সুরে অবতাররূপী নারায়ণের মর্তলোকে গীতা-বর্ণিত আবির্ভাবের ঘোষণাটি যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গত করে গেয়ে শোনালেন সুরদাসরূপী শিল্পী দলের অন্যতম গায়ক দীপক কুমার। ''যদা যদা হি ধর্মস্য...অভ্যুত্থানম্ অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্''—এখানে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, সব একাকার। অহল্যা-উদ্ধার, গুহকের সঙ্গে মিত্রতা, ভরত মিলাপ, হনুমান-সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা। অনসূয়াকে নবধা-ভক্তি উপদেশ, ভাষ্য ও গানে উঠে এসেছে। রামচরিত মানসের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বেশ কয়েকটি রামের ভজন-এর সময়োপযোগী সংযোজন সম্পূর্ণ উপস্থাপনাকে এক আলাদা মাত্রা দিয়েছিল।

কথা হচ্ছিল হরি বিয়োমের সঙ্গে। তিনি গত ১১ বছর ধরে সল্টলেকে ই সি-৫০ (সেক্টর-১)-এ গড়ে তুলেছেন ভারতেন্দু অন্ধ আশ্রম। সেখানেই সপরিবারে (স্ত্রী, পুত্র, কন্যা) অন্ধ ছাত্রদের নিয়ে একসঙ্গেই থাকেন। মূলত, বিহারের সীবান জেলার বাসিন্দা। তাঁর বক্তব্য, এই অন্ধদের মধ্যেই প্রতিভা সঞ্চিত আছে। চোখ নেই তো কী? মন্ কি আঁখে খোল্—এই ভাবনা থেকেই তিনি তালিম দিয়েছেন। ছেলেরা লেখাপড়াও শিখছে। রামচরিতমানস ছাড়াও সিরডির সাঁইবাবাকে নিয়েও গীতি আলেখ্য রচনা করেছেন হরি বিয়োমজী। তিনি নিজে একসময় সরকারের ন্যাশন্যাল স্কুল অফ্ ড্রামা-তে কাজ করেছেন কৃতিত্বের সঙ্গে। সব ছেড়ে এখন ভারতেন্দু অন্ধ আশ্রম-ই তাঁর দিবারাত্রের ধ্যান জ্ঞান। এখন ১৬ জন অন্ধকে নিয়ে আশ্রম চলছে। ছেলে, মেয়ে সহধর্মিনীর সাহায্য তো আছেই। দু'-তিনজন কর্মীও রেখেছেন। অন্ধ, গরীব এবং প্রতিভাবানদের তিনি আশ্রয়, শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করতে আগ্রহী। এজন্য সল্টলেকে দানে পাওয়া চারকাঠা জমির ওপর তৈরি হচ্ছে চারতলা 'দ্বারকামাই' ভবন, কাজ চলছে। চলছে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধনসংগ্রহ। মুম্বাই-এ সিরডি সাঁই মন্দিরে অনুষ্ঠান করেছেন। একই অনুষ্ঠান হবে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি জামসেদপুরে। আশ্রমকে প্রদত্ত দান ৮০জি ধারা মতে আয়কর মুক্ত। অনেক নামী-দামী লোকেদের নিয়ে কমিটি করেছেন। পঞ্জীকরণ হয়েছে। ভারতেন্দু অন্ধ আশ্রমে আলাপচারিতায় তিনি জানালেন—এই কাজে তাঁর প্রেরণা ঈশ্বর নির্দিষ্ট। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা। সঙ্ঘের সেবাকাজের বিভিন্ন প্রকল্পের কথা শুনে শ্রদ্ধায় অবনত। আশ্রমের বর্তমান ঠিকানা—EC-50, Sector 1, Salt Lake City–Kolkata-64 এবং দূরভাষ-2321-6413 মোবাইল—9903027986; ইমেল নং--bharatenduaa @yahoo.in

কলামন্দিরে গীতি আলেখ্য উপস্থাপনা দর্শক-শ্রোতাদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। কলামন্দিরে দালালজীর অভিনন্দনের পুষ্পস্তবক নিজে না নিয়ে দেওয়ালেন অন্ধ ও পঙ্গু শ্যামল দাসকে। সব মিলিয়েই বাস্তবিকই এক ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান। কানে তখনও যেন বাজছে—মঙ্গলভাবনা অমঙ্গলহারী...।

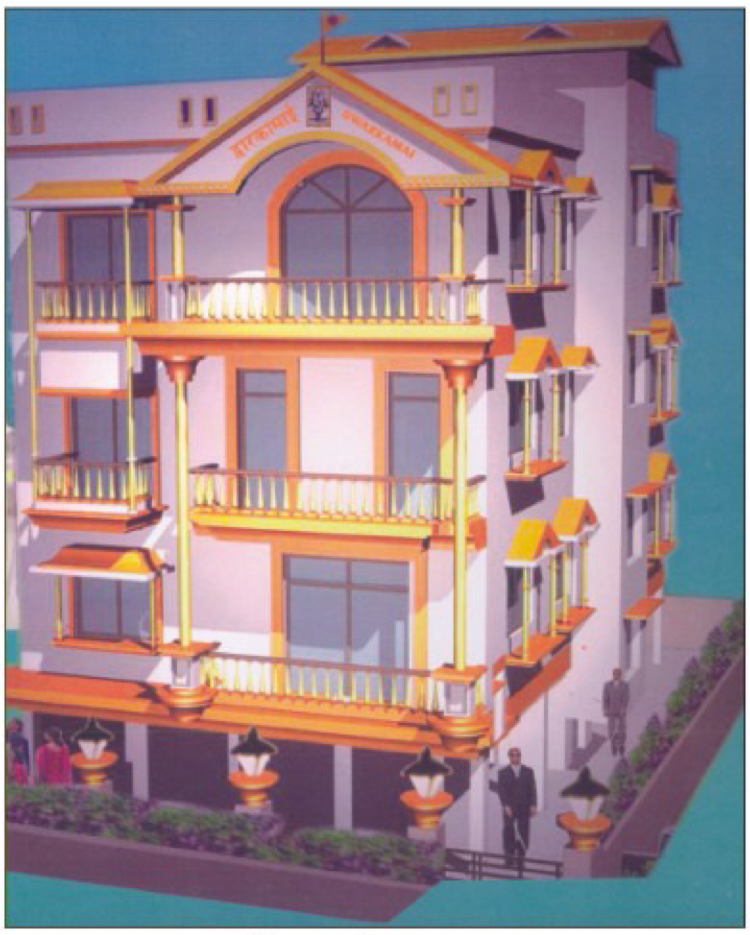

সল্টলেকে প্রস্তাবিত ভবনের মডেল।

প্রকাশিত হবে ১৪ ডিসেম্বর '০৯

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৪ ডিসেম্বর '০৯

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বৃটেনের বিজ্ঞানী তথা গবেষকগণ সেদিন যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, জার্মানির সুবিখ্যাত দার্শনিক ডঃ সুমেকার তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে যে মন্তব্য করেছিলেন, মার্কিন দার্শনিক স্যামুয়েল হান্টিংটন সভ্যতার সংকট থেকে পরিত্রাণের তথা মানবিকগুণের সংরক্ষণ, সংবর্দ্ধনের জন্য যে তত্ত্ব তুলে ধরতে চেয়েছেন তা কিন্তু আমাদের শত-সহস্র মুনি ঋষির লক্ষ লক্ষ বছরের ভাবনা চিন্তার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। এক কথায় এসবেরই ফলিত প্রয়োগ হল একল বিদ্যালয় অভিযান।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিশেষ বিষয় একল বিদ্যালয় অভিযান।

।। নিয়মিত আকারেই প্রকাশিত হবে।। দাম একই থাকছে।।

Steelam
EXCLUSIVE FURNITURE
স্টীলম এর ......
পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে
Exclusive Show Room
দেওয়া হইবে॥
Factory :- 9732562101

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক : বিজয় আঢ্য, দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স : ২২৪১-৫৯১৫, e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com